Vol. 49 | No. 3 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ছড়ার ছবি : রবীন্দ্র-স্মৃতিকথার পদ্য

Volume	49
Issue	3
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Mohammad Shahed
Published online	June 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v49i3(2).3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i3(2).3
Pages	৪১-৭৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

ছড়ার ছবি : রবীন্দ্র-স্মৃতিকথার পদ্য

Check for updates

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ*

'ছড়া' অভিধা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থমলাটে প্রথমবারের মতো বন্দি হলো কবির ৭৭ বছর বয়সে; সে গৌরব *ছড়ার ছবি*-র। "এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা" — ঘোষণার মধ্য দিয়ে কবি জানিয়ে দিলেন এটি ছড়াগ্রন্থ। শিল্পী "নন্দলাল বসু-অঙ্কিত প্রচ্ছদ, একত্রিশখানি রেখাচিত্র ও সাতখানি টোনের ছবি-সংবলিত" *ছড়ার ছবি*-র প্রথম প্রকাশ ১৩৪৪ সনের আশ্বিনে; *খাপছাড়া* এর আগের বছরের মাঘ মাসে। ইংরেজি বছরের হিসেবে অবশ্য *খাপছাড়া*, *কালান্তর*, *সে*, *ছড়ার ছবি*, *বিশ্ব-পরিচয়* একই বছরের প্রকাশনা — ১৯৩৭-এর।

গ্রীষ্ম ও পূজার অবকাশে শান্তিনিকেতন-কলকাতার বাইরে যাওয়া ছিল কবির প্রিয় শখ। ১৯৩৭-এ গ্রীষ্ম-অবকাশে ভাবলেন ['খেলা', *ছড়ার ছবি*]

> কাজ ক'রে মন অসাড় যখন মাথা যাচ্ছে ঘুরে
> হিমালয়ের খেলা দেখতে এলেম অনেক দূরে।

১৩৪৪ সনের ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল ১৯৩৭) পান্‌জাব মেলে বেরেলি হয়ে এবং পরে কাঠগোদাম থেকে মোটরগাড়িতে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আলমোড়া সেনানিবাসের একটি উঁচু শৈলশিখরে ভাড়া করা বাড়িতে ওঠেন কবি। সঙ্গে পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, পৌত্রী নন্দিনী-নন্দিতা এবং সচিব অনিলকুমার চন্দ [অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০২ : ৩২৮]। কোলাহলহীন নির্জন পার্বত্য পরিবেশ, বাইরে "বর্ষা নামলো অসময়ে"; তারপরও ইন্দিরা দেবীর কাছে লেখা পত্রে জানা যায় — কবির "জীবনশক্তিতে ... কিছু উদ্বৃত্ত জমা" হয়েছে। *আনন্দবাজার* পত্রিকায় কবির এ-সময়ের কাজ সম্পর্কে যে রিপোর্ট ছাপা হয় [দ্র. অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০২ : ৩৩০] তাতে বলা হয়, "...জগতের লোক হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, কবি এখানে গভীর মনোনিবেশ সহকারে বিজ্ঞান বিষয়ে নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া সময় কাটাইতেছেন। ... কবি বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ভাষায় প্রাথমিক বিজ্ঞান সম্পর্কে একখানি বই লিখিতে ব্যস্ত।"

১৩ আষাঢ় ১৩৪৪ (২৭ জুন ১৯৩৭) আলমোড়া ত্যাগ করে দু'দিন পরে কলকাতায় পৌঁছেন কবি এবং পরদিন শান্তিনিকেতন চলে আসেন। এর দু'সপ্তাহ পর ২৭ জুলাই পতিসর যান পুণ্যাহ উৎসবে যোগ দিতে। 'মাকাল' ছাড়া *ছড়ার ছবি*-র সব লেখা আলমোড়া পৌঁছা থেকে পতিসর থাকার সময়ের মধ্যে রচিত। কানাই সামন্ত মনে করেন যে [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৬ : ১১৩] "যেমন লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালার বিশ্বপরিচয় তেমনি 'ছেলেদের জন্য' ছড়ার ছবি লিখিবার পূর্বসংকল্প লইয়াই কবি [আলমোড়া] যাত্রা করেন ইহা তেমন অসম্ভব নয়"।

---

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ-বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন :

> ক. আলমোড়া আসিবার সময় নন্দলাল-বসু-অঙ্কিত কতকগুলি স্কেচ কবি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন; সেইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া 'ছড়ার ছবি' একটির পর একটি লিখিয়া যান। ...আলমোড়া-বাসকালে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (১৩৪৪) মাসে যে কবিতাগুলি লিখিলেন, তাহার সব কয়টিই যে 'ছড়ার ছবি'তে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নহে। নন্দলালের ছবিগুলি কবিতা লিখিতে তাঁহাকে প্রেরণা দিয়াছিল নিঃসন্দেহেই; কিন্তু কাগজে আঁকা ছবির বাহিরে বৃহত্তর জগতের চলতি ছবিও তাঁহাকে কয়েকটি কবিতা লিখিতে উদ্রিক্ত করে। ... দুই মাস পরে আলমোড়া হইতে কবি শান্তিনিকেতন ফিরিলেন (১৬ আষাঢ় ১৩৪৪)। ... 'ছড়ার ছবি'র সুর এখনো মিলাইয়া যায় নাই; বালক, দেশান্তরী, অচলা বুড়ি, সুধিয়া, মাধো, আতার বিচি প্রভৃতি ওই সময়ের লেখা। [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪০১ : ৯৭-১০১]
>
> খ. 'বিশ্বপরিচয়' লেখার সঙ্গে সঙ্গে চলছে শিশুদের জন্য কবিতা-রচনা; সেগুলি সংকলন করে হল 'ছড়ার ছবি'। নন্দলালের স্কেচগুলি দেখে যে কল্পনা ও কাহিনী তাঁর মনে জেগেছে তাই স্বচ্ছন্দ ভাষায় হাল্‌কা ছন্দে সুন্দর করে লিখলেন। [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৯৫ : ১৭৪]

ছড়ার ছবি-তে মোট রচনার সংখ্যা ৩২। 'মাকাল' বাদে বাকি ৩১টি রচনার সবই ১৯৩৭ সালের জুন থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে লেখা। এর ২৯টিতে রচনার নিচে স্থানের নাম আছে; তার মধ্যে চারটি শান্তিনিকেতনে এবং একটি পতিসরে রচিত; বাকি ২৪টি আলমোড়ায়। কানাই সামন্তের মতে, স্থান-উল্লেখবিহীন তিনটি রচনার মধ্যে দুটো কলকাতায় ('মাধো' ও 'আতার বিচি') এবং একটি শান্তিনিকেতনে ('মাকাল') লেখা [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৬ : ১১৪-১৫]। তিনি করেন যে, 'পাথরপিণ্ড' আলমোড়া যাবার পূর্বে বৈশাখ মাসে শান্তিনিকেতনে বসে লেখা। *ছড়ার ছবি*-র শ্রাবণ ১৩৭৯ সংস্করণের 'গ্রন্থপরিচয়'-এ কানাই সামন্ত উল্লেখ করেছেন, এ-গ্রন্থের রচনার স্থানকাল *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-র একবিংশ খণ্ডে অন্তর্ভুক্তির সময় একবার সংশোধন করা হয়েছিল এবং গ্রন্থের ১৩৭৯ সংস্করণে আর একবার সংশোধন করা হয় [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৬ : ১১৯]। 'মাকাল' *ছড়ার ছবি*-র অন্য রচনাগুলোর ৬ বছর আগের লেখা; কবির হাতের লেখায় এটি *সন্দেশ*-এর পৌষ ১৩৩৮ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল।

ক.

ছড়ার ছবি-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ছড়ার ছন্দ, ভাষা, বিষয়ের অর্থবোধকতা, ধ্বনি এবং এতে উপস্থাপিত চরিত্রগুলোর সামাজিক অবস্থান নিয়ে। কিন্তু এর ৩ বছর পরে কবির ৭৯ বছর বয়সে যখন ছেলেবেলা (১৯৪০) প্রকাশিত হলো, তখন কবি জানালেন তাঁর শৈশবস্মৃতির প্রথম বই *ছেলেবেলা* নয়, *ছড়ার ছবি* :

> কিছুকাল হল একটা কবিতার বইয়ে এর [*ছেলেবেলা*-র] কিছু কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল। সেটা পদ্যের ফিল্‌মে। বইটার নাম 'ছড়ার ছবি'। তাতে বকুনি ছিল কিছু নাবালকের, কিছু সাবালকের। তাতে খুশির প্রকাশ ছিল অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ১৩ : ৭০৭]

কবির শেষবারের মংপু অবকাশে (১৯৩৯) শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে যাবার পথে মৈত্রেয়ী দেবীকেও বলেছিলেন প্রায় একই কথা :

> কাছাকাছি সবকিছু পেরিয়ে মন চলে যায় সেই জীবনের কেন্দ্রে [ছেলেবেলায়] — লিখতে বসলে সেইখানেই মনটা ঘোরাফেরা করে। 'ছড়া ও ছবি'তে আমার ছেলেবেলার কথা ছড়িয়ে আছে। ... এসব বর্ণনা পরে 'ছেলেবেলা'তে লিখেছিলুম এবং কিছু কিছু ছড়িয়ে আছে 'ছড়া ও ছবি'র এবং অন্যান্য নানা কবিতায়। [মৈত্রেয়ী দেবী ১৯৬৭ : ১৬৬-৬৭]

ছড়ার ছবি-র সঙ্গে শৈশবস্মৃতির একটা সম্পর্ক আছে, তার অন্য একটি সংকেত *ছেলেবেলা* গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে *ছড়ার ছবি*-র 'বালক' রচনাটির মুদ্রণ। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন, 'কাঠের সিঙ্গি', 'প্রবাসে', 'পদ্মায়', 'বালক', 'আতার বিচি' — এই পাঁচটি রচনা "স্মৃতি দিয়ে আঁকা" [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪০১ : ৯০]। আরও পরে শুদ্ধসত্ত্ব বসু এই পাঁচটি রচনা প্রসঙ্গেই বলেছেন যে, "বাল্যস্মৃতির আবেশে কবি বিভোর" [শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৪০৬ : ২৩১]। জগদীশ ভট্টাচার্য ঐ পাঁচটিকেই আখ্যায়িত করেছেন, "ব্যক্তিজীবনের চিত্রশিল্প" অভিধায় [জগদীশ ভট্টাচার্য : ৪১৪]। সুকুমার সেন মনে করেন যে, *ছড়ার ছবি*-তে সামগ্রিকভাবেই "বাল্য ও যৌবনস্মৃতি প্রতিফলিত" [সুকুমার সেন ১৯৯৬ : ১৫৯]। অজিত দত্তের বিশ্লেষণে গ্রন্থটি "স্মৃতিতে কল্পনায় বিজড়িত ছড়ায় আঁকা ... ছবি" [অজিত দত্ত ১৯৬০ : ৩১৭]; আর ক্ষুদিরাম দাসের ভাষায় তা "বাল্যস্মৃতির রূপে-রসে আবিষ্ট" [ক্ষুদিরাম দাস ১৯৯৪ : ২৮৮]।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের প্রথম ২৬/২৭ বছর কেটেছে মূলত জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। শান্তিনিকেতন, হিমালয়, মুসুরী, দার্জিলিঙ, করোয়া, গাজিপুর, সোলাপুর, পুনা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের সময়টা বাদ দিলে কবির জীবনের প্রথম দু'যুগের স্মৃতি দ্বারকানাথ-দেবেন্দ্রনাথের বানানো ঐ বিশাল বিচিত্র অট্টালিকা ও তার চারপাশকে ঘিরে। *ছড়ার ছবি*-র 'বালক' (শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩৪৪)-এ জোড়াসাঁকোর বাড়ি ও তার চারপাশটা প্রত্যক্ষ :

> বয়স তখন কাঁচা; ...
> ... ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত গলির ওপার থেকে,
> তপসিমাছের ঝুড়ি নিত গামছা দিয়ে ঢেকে।
> বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের 'পরে দাদা,
> সন্ধ্যাতারার সুরে যেন সুর হত তাঁর সাধা।
> জুটেছি বৌদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে,
> মুখখানিতে-ঘের-দেওয়া তাঁর শাড়িটি লালপেড়ে।
> চুরি ক'রে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে
> স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান উপদ্রবে।
> কঙ্কালী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে—
> বাঁহাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
> দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া,
> থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া—
> ... স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে
> হঠাৎ দেখি মেঘ নেমেছে ছাদের কাছে ঘেঁষে।...

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বেহালা সাধা, "নতুন বৌঠান" কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে নানা দুষ্টুমি, কিশোরী চাটুজ্জের রামায়ণের ছড়া, লেখাপড়ায় অনীহা, বাড়ির চারপাশে বৃষ্টি নামা, ছাদে পায়রার ঝাঁক, বারান্দার রেলিঙে কাক, ফেরিওয়ালার ডাক — রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় প্রায় একই বিবরণ আমরা পাই :

ক. রাঙা হয়ে আসত রোদ্দুর, চিল ডেকে যেত আকাশে। সামনের গলি দিয়ে হেঁকে যেত চুড়িওয়ালা। সেদিনকার দুপুরবেলাকার সেই চুপচাপ বেলা আজ আর নেই, আর নেই সেই চুপচাপ বেলার ফেরিওয়ালা। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ১৩ : ৭২৫]

খ. বউঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, ...। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ১৩ : ৭২৮]

গ. বউঠাকুরুনের জায়গা হল বাড়ি-ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে। ... পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাত পড়ত সেইখানে। নেমন্তনের দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠত এই ছেলেমানুষ। ... মাঝে মাঝে যখন আত্মীয়-বাড়িতে যেতেন, ঘরের সামনে তাঁর চটিজুতোজোড়া দেখতে পেতুম না, তখন রাগ করে ঘরের থেকে একটা কোনো দামি জিনিস লুকিয়ে রেখে ঝগড়ার পত্তন করতুম। বলতে হত, 'তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে। আমি কি চৌকিদার'। তিনি রাগ দেখিয়ে বলতেন, 'তোমাকে আমার ঘর সামলাতে হবে না, নিজের হাত সামলিয়ো'। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ১৩ : ৭২৭]

ঘ. ... হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচরণ কিশোরী চাটুজ্জে আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুত গতিতে [রামায়ণের] বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল। ... অনুপ্রাসের ঝক্‌মকি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ৯ : ৪২০]

ঙ. ব্রজেশ্বরের কাছে সন্ধ্যেবেলায় দিনে দিনে শুনেছি কৃত্তিবাসের সাতকাণ্ড রামায়ণটা। সেই পড়ার মাঝে মাঝে এসে পড়ত কিশোরী চাটুজ্যে। ... হঠাৎ আসন দখল করে কৃত্তিবাসকে ছাপিয়ে দিয়ে হু হু করে আউড়িয়ে যেত তাঁর পাঁচালির পালা। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ১৩ : ৭১৬]

'বালক' রচনাটি *ছেলেবেলা* ও *জীবনস্মৃতি*-র এসব বর্ণনার পদ্যরূপ, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কিশোরী চাটুজ্জের অবয়বের মতো কিছু বাড়তি বিবরণও আছে। আবার, কাদম্বরী দেবীর শাড়ি স্মৃতিকথায় কালোপেড়ে বা অন্যরকম, লালপেড়ে নয়।

ন'বছর বয়সে জোড়াসাঁকোর দো'তলার বড় বারান্দার পড়ার ঘরের কোণে বালি জমিয়ে আতার বিচি পুঁতে চারা তৈরির চেষ্টার স্মৃতি 'আতার বিচি' (শ্রাবণ ১৩৪৪)। রচনাটিতে দেখা যায়, পুঁথিপত্র-খাতা ভরা টেবিলে মন্মথ মাস্টারের সঙ্গে কথক পড়তে বসেছেন। কিন্তু পড়ার চেয়ে কৌতূহলমাখা উত্তেজনা নিয়ে কবির দৃষ্টি — "গাছ বুঝি আজ দেখা দেবে"! দু'মাস পরে শুক্রবারে চুন-সুরকির কোণে প্রথম অঙ্কুর দেখা গেল। কবির "নাচ লাগালো মনে"; নাম দিলেন "আতা গাছের খুকু"; "ক্ষণে ক্ষণে দেখতে" যেতেন "বাড়ল কতটুকু"। কিন্তু এতে পড়ায় অমনোযোগী হওয়ায় দায়ী করা হলো আতাশিশুকে; মাস্টার গাছটিকে "মৃত্যুদণ্ড" দিলেন — "কচি কচি পাতার কুঁড়ি হল খণ্ড খণ্ড"। কবির বুক ফেটে "অশ্রু ঝরল চোখে।" দাদা বললেন, "শান-বাঁধানো মেঝে ... আতার বীজ লাগানো ঘোর বোকামি"! কিন্তু কবির প্রশ্ন, "বড়োদের এই জোর খাটানো অন্যায় নয় কি এ!"

'আতার বিচি'র এই বর্ণনায় প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার মিশ্রণ আছে। *ছেলেবেলা*-য় পাওয়া যায় প্রকৃত ঘটনা :

> বারান্দার এক কোণে ঝাঁট দিয়ে জমা করা ধুলোর মধ্যে পুঁতেছিলুম আতার বিচি। কবে তার থেকে কচি পাতা বেরবে দেখবার জন্য মন ছট্‌ফট্ করছে। নীলকমল মাস্টার উঠে গেলেই ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসা চাই। শেষ পর্যন্ত আমার আশা মেটেনি। যে ঝাঁটা একদিন ধুলো জমিয়ে ছিল সেই ঝাঁটাই দিয়েছিল ধুলো উড়িয়ে । [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ১৩ : ৭২৩]

জীবনস্মৃতি-র 'ঘর ও বাহির' অধ্যায়েও প্রসঙ্গটি আছে; যেখানে কবির মনোজগতের আরও বৃহত্তর পরিসরে ঘটনাটি উপস্থাপিত :

> ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। ...
>
> ... বেশ মনে পড়ে, দক্ষিণের বারান্দার এক কোণে আতার বিচি পুঁতিয়া রোজ জল দিতাম। সেই বিচি হইতে যে গাছ হইতেও পারে এ-কথা মনে করিয়া ভারি বিস্ময় এবং ঔৎসুক্য জন্মিত। ...
>
> ... গুণদাদার [গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর] বাগানের ক্রীড়াশৈল হইতে পাথর চুরি করিয়া আনিয়া আমাদের পড়িবার ঘরের এক কোণে আমরা নকল পাহাড় তৈরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম — তাহারই মাঝে মাঝে ফুলগাছের চারা পুঁতিয়া সেবার আতিশয্যে তাহাদের প্রতি এত উপদ্রব করিতাম যে নিতান্তই গাছ বলিয়া তাহারা চুপ করিয়া থাকিত এবং মরিতে বিলম্ব করিত না। এই পাহাড়টার প্রতি আমাদের কী আনন্দ এবং কী বিস্ময় ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মনে বিশ্বাস ছিল, আমাদের এই সৃষ্টি গুরুজনের পক্ষেও নিশ্চয় আশ্চর্যের সামগ্রী হইবে; সেই বিশ্বাসের যেদিন পরীক্ষা করিতে গেলাম সেইদিনই আমাদের গৃহকোণের পাহাড় তাহার গাছাপালা-সমেত কোথায় অন্তর্ধান করিল। ইস্কুলঘরের কোণ যে পাহাড় সৃষ্টির উপযুক্ত ভিত্তি নহে, এমন অকস্মাৎ এমন রূঢ়ভাবে সে শিক্ষা লাভ করিয়া বড়োই দুঃখ বোধ করিয়াছিলাম। আমাদের লীলার সঙ্গে বড়োদের ইচ্ছার যে এত প্রভেদ তাহা স্মরণ করিয়া, গৃহভিত্তির অপসারিত প্রস্তরভার আমাদের মনের মধ্যে আসিয়া চাপিয়া বসিল। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ৯ : ৪১৮]

সৃষ্টি ও প্রকৃতির রহস্যে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই বিস্মিত হয়েছেন এবং নিজের কর্মকে তার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে চেয়েছেন — 'আতার বিচি'র ঘটনা এর কৈশোরক প্রকাশ। অন্যদিকে, ছোটদের ওপর বড়দের ইচ্ছা বা শাসনকে চাপিয়ে দেয়ার প্রচলিত রীতি তিনি কখনো মানতে পারেননি — এই রচনায় তাই স্পষ্ট করেই বলেছেন, "বড়োদের এই জোর খাটানো অন্যায়"।

'কাঠের সিঙ্গি' (আলমোড়া, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪) নিয়ে কবির কল্পনার সময়টি নিশ্চিতভাবেই আরও শৈশবের। "ছেলেবেলায় ... বীরপুরুষি খেলায়" সিঙ্গির গলায় বাঁধলেন "রাঙা ফিতের দড়ি", পিঠে বসিয়ে দিলেন চিনেমাটির ব্যাঙ এবং ব্যাঙের পতন হলে কষে ধমক, "চুপ করো" বলে ধমকানো, এমনভাবে মার দেবার চিন্তা যাতে সিঙ্গি "দু চক্ষে ... অন্ধকার" দেখে — কবি কল্পনায় এসবকে খুব স্বাভাবিক মনে হয়। তাই তার দাবি :

আমার রাজ্যে আর যা থাকুক সিংহভয়ের কোনো
সম্ভাবনা ছিল না কখ্খনো! ...
... ইতিহাসে এমন শাসন করে নি কেউ পাঠ,
দিবানিশি কাঠের সিঙ্গি ভয়েই ছিল কাঠ।

ছেলেবেলা গ্রন্থে কাঠের সিঙ্গিকে বলিদানের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন কবি শৈশব পার হওয়ার অন্তত সাত দশক পরে :

> আরো একটা খেলা ছিল, সে আমার কাঠের সিঙ্গিকে নিয়ে। পূজায় বলিদানের গল্প শুনে ঠিক করেছিলুম সিঙ্গিকে বলি দিলে খুব একটা কাণ্ড হবে। তার পিঠে কাঠি দিয়ে অনেক কোপ দিয়েছি। মন্তর বানাতে হয়েছিল, নইলে পূজা হয় না —
>
> সিঙ্গিমামা কাটুম
> আন্দিবোসের বাটুম
> উলুকূট ঢুলুকূট ঢ্যামকুড়কুড়ু
> আখরোট বাখরোট খট্খট্ খটাস্
> পট্ পট্ পটাস।
>
> এর মধ্যে প্রায় সব কথাই ধার-করা, কেবল আখরোট কথাটা আমার নিজের। আখরোট খেতে ভালোবাসতুম। খটাস্ শব্দ থেকে বোঝা যাবে আমার খাঁড়াটা ছিল কাঠের। আর পটাস্ শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে সে খাঁড়া মজবুত ছিল না। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ১৩ : ৭১৪]

ছড়ার ছবি-র পাঠে অবশ্য পশু-বলিদানের বিষয়টি একেবারেই নেই। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ পশু-বলিদানের পাশবিকতাকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন — *রাজর্ষি* ও *বিসর্জন* তার শিল্পিত রূপায়ণ।

অনুত্তম ভট্টাচার্য এ-রচনার সঙ্গে কবির 'বীরপুরুষ' কবিতা এবং কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর সর্বদমনের সিংহক্রীড়ার তুলনা করেছেন [অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০২ : ৩৩৭]। রচনাটির শেষ দুই চরণে নারী-পুরুষের শক্তি-সাহসের প্রভেদের ইঙ্গিত আছে। মেজ্দিদি-ছোড়ুদিদির পুতুল খেলায় নিয়মিত নিমন্ত্রণ খেলেও তাঁর দাবি :

পুরুষ আমি, সিঙ্গিমামা নত পায়ের কাছে,
এমন খেলার সাহস বলো কজন মেয়ের আছে ?

শিশু-কিশোরদের জন্য রবীন্দ্রনাথের রচনায় খুকুর চেয়ে খোকা সবল, এমনকি মায়ের চেয়েও খোকা সবল এমন মনোভাবের পরিচয় আছে। 'বীরপুরুষ' কবিতায় খোকা যখন ডাকাতদের মাথা কাটছে, মা তখন "পালকিতে এক কোণে ঠাকুর-দেবতা স্মরণ" করছেন! *শিশু* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে *রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থ*-এর সম্পাদক মোহিতচন্দ্র সেনের স্ত্রী সুশীলা দেবী কবির কাছে জানতে চেয়েছিলেন, "সব কবিতাই খোকার জবানিতে লেখা, খুকির নামে একটা কবিতাও নেই কেন" [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৯৫ : ৬১]। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথের যে বক্তব্য তাতে মনে হয় যে, পুত্র শমীন্দ্রনাথের স্মৃতিই তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নারী তার আপন ভাগ্য জয় করতে চায়, যেমন, 'সবলা'য় নারী প্রশ্ন করে :

... কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গাপাশে?
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি পণ?

পূর্ণ রচনার বাইরে দুটি রচনাংশে জোড়াসাঁকোর স্মৃতি প্রত্যক্ষ। এর একটি 'যোগীন দা', অন্যটি 'আকাশ'। যোগীনদার গল্পের আসরের বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ফিরে যান ঠাকুরবাড়িতে শৈশবের গল্প শোনার আবহে :

দিন ফুরোত, কুলুঙ্গিতে প্রদীপ দিত জ্বালি,
বেলের মালা হেঁকে যেত মোড়ের মাথার মালী।
... কাসর-ঘণ্টা উঠত বেজে গলির শিবালয়ে।
... ঘরের কোণে কোণে ছায়া, আঁধার বাড়ত ক্রমে–
মিট্‌মিটে এক তেলের আলোয় গল্প উঠত জমে।

'আকাশ'-এর আকাশ জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদ থেকে শিশু-রবির চোখে দেখা আকাশ, কবির স্বীকারোক্তিতে তা স্পষ্ট :

শিশুকালের থেকে
আকাশ আমার মুখে চেয়ে একলা গেছে ডেকে।
দিন কাটত কোণের ঘরে দেয়াল-দিয়ে-ঘেরা ...
... লুকিয়ে যেতেম ছাতে —
চুরি করতেম আকাশ-ভরা সোনার-বরন ছুটি, ...
... দুপুর রৌদ্রে সুদূর শূন্যে আর কোনো নেই পাখি,
কেবল একটি সঙ্গীবিহীন চিল উড়ে যায় ডাকি

এর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় *ছেলেবেলা*-র বর্ণনা :

ক. আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ। ... [পিতা পাহাড়ে গেলে] তখন ঐ ছাদে যাওয়া ছিল আমার সাত-সমুদ্দুর পারে যাওয়ার আনন্দ। ... আমি লুকিয়ে ছাদে উঠতুম প্রায়ই দুপুরবেলায়। ... রাঙা হয়ে আসত রোদদুর, চিল ডেকে যেত আকাশে। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ১৪ : ৭২৫]

খ. তাহার পরে সম্মুখের জনশূন্য খোলা ছাদের উপর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিত, তাহাতেও মনটা উদাস করিয়া দিত। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ৯ : ৪১৬]

জোড়াসাঁকোর বাইরের স্মৃতির মধ্যে গাজিপুর বাসের স্মৃতি *ছড়ার ছবি*-র 'প্রবাসে' রচনায় প্রত্যক্ষ। ১৮৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি (ফাল্গুন ১২৯৪) মাসে ১৫ বছর বয়সী স্ত্রী মৃণালিনী দেবী ও এক বছরের কন্যা বেলাকে নিয়ে গাজিপুর যান কবি; কলকাতায় ফিরে আসেন বর্ষার শুরুতে [অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০২ : ৩৪২ এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৯৫ : ৩২]। গাজিপুরের পরিবেশে কবির "কাব্যরচনার একটা নতুন পর্ব প্রকাশ পেল"; এর ফসল *মানসী*-র ২৮টি কবিতা।

১৯৪০ সালে রচনাবলিতে অন্তর্ভুক্তির সময় *মানসী*-র সূচনায় কবি গাজিপুর বাসের স্মৃতি-রোমন্থন করেন (২৮.২.১৯৪০, উদয়ন) এভাবে :

> বাল্যকাল থেকে পশ্চিম ভারত আমার কাছে রোম্যান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল। এইখানেই নিরবচ্ছিন্নকাল বিদেশীয়দের সঙ্গে এ দেশের সংযোগ ও সংঘর্ষ ঘটে এসেছে। ... এত দেশ থাকতে কেন যে গাজিপুর বেছে নিয়েছিলুম তার দুটো কারণ আছে। শুনেছিলুম গাজিপুরে আছে গোলাপের ক্ষেত। ... সেখানে গিয়ে দেখলুম ব্যবসাদারের গোলাপের ক্ষেত, ... হারিয়ে গেল সেই ছবি।
>
> ... একখানা বড়ো বাংলো পাওয়া গেল, গঙ্গার ধারেও বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইলখানেক চর পড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার শর্ষের খেত; দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণটানা নৌকো চলেছে মন্থরগতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি, অনাদৃত, ...। ইঁদারা থেকে পূর চলছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলকচাঁপার ঘনপল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে প্রাচীন একটা মহানিমগাছ, তাঁর বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা। সাদা রাস্তার ধুলো চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায় খোলার-চালওয়ালা পল্লী। ... মন নিমগ্ন হল অক্ষুণ্ন আকাশের মধ্যে।

একদিকে "ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীত যুগের স্পর্শলাভ", এবং অন্যদিকে গোলাপের ক্ষেতের পাশে বাস — এই দুই আকর্ষণে কবি গাজিপুর যান। কিন্তু গোলাপের সমারোহে বুলবুল আর কবি অপাঙ্‌ক্তেয়, এই বোধ তাঁকে আশাহত করে। তবে *ছড়ার ছবি* রচনার ৫ বছর আগে পারস্য-ভ্রমণের সময় (এপ্রিল-মে ১৯৩২) ৭ দিন শিরাজ শহরে বাস করে "পারস্যের গুল্‌বেহেস্তের শোভা ও সৌন্দর্য উপভোগ" [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৯৫ : ১৫৯] করেছিলেন।

মানসী-র ২৮টি কবিতার পটভূমিরূপে কবি যা বলেছিলেন, *ছড়ার ছবি*-র 'প্রবাসে' রচনাকে তার সম্পূরক পদ্যরূপ বলা যেতে পারে:

বাংলাদেশের বাইরে গেলেম গঙ্গাপারে চ'লে।
লোকের মুখে গল্প শুনে গোলাপ-ক্ষেতের টানে
মনটা গেল এক দৌড়ে গাজিপুরের পানে।
সামনে চেয়ে চেয়ে দেখি গম-জোয়ারির ক্ষেতে ...
আটচালা ঘর, ডাহিন দিকে সব্‌জি-বাগানখানা
শুশ্রূষা পায় সারা দুপুর জোড়া-বলদ-টানা
আঁকাবাঁকা কল্‌কলানি করুণ জলের ধারায় —
চাকার শব্দে অলস প্রহর ঘুমের ভরে ভারায়।
ইঁদারাটার কাছে
বেগনি ফলে তুঁতের শাখা রঙিন হয়ে আছে।
অনেক দূরে জলের রেখা চরের কূলে কূলে,
ছবির মতো নৌকো চলে পাল-তোলা মাস্তুলে।
সাদা ধুলো হাওয়ায় ওড়ে, পথের কিনারায়
গ্রামটি দেখা যায়।
খোলার চালের কুটীরগুলি লাগাও গায়ে গায়ে

মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আম-কাঁঠালের ছায়ে।
গোরুর গাড়ি পড়ে আছে মহানিমের তলে;
ডোবার মধ্যে পাতা-পচা পাঁক-জমানো জলে
গভীর ঔদাস্যে অলস আছে মহিষগুলি
এ ওর পিঠে আরামে ঘাড় তুলি। ...
অশথ-তলায় বসে তাকাই ধেনুচারণ মাঠে,
আকাশে মন পেতে দিয়ে সমস্ত দিন কাটে। ...

ছড়ার ছবি-র এই বর্ণনায় বরং স্মৃতির কিছু বাড়তি উপকরণ পাওয়া যায়; যেমন, জোড়া বলদে জল টানা, ডোবার মধ্যে মহিষ, তুঁতের রঙিন শাখা, প্রভৃতি। আবার প্রশ্ন জাগে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় প্রাঙ্গণ "আম-কাঁঠালের ছায়ে"-র মধ্যে কী পশ্চিম ভারতের প্রকৃতির সঙ্গে বাংলার প্রকৃতি মিশে গেছে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও রচনায় পদ্মানদীর প্রভাব অপরিমেয়। ২৯ বছর বয়সে (১৮৮৯) জমিদারির ভার পেয়ে পদ্মানদীতে বসবাসের সেই যে শুরু, তার শেষ হয়েছিল ১৯৩৭-এ পতিসর জমিদারিতে শেষ পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে। শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর যাত্রা এবং কখনো নদীর পারের কাচারিতে বাস, কখনো-বা পদ্মায় নৌকাবাস; এমন কি যুবক বয়সে যখন শিলাইদহের চরে থাকতেন তখন একবার সাঁতার দিয়ে পদ্মা পেরিয়েছিলেন [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ১৩ : ৭৩৫]। এ নিয়ে পদ্মা তাঁর জীবনের বিপুল অংশ অধিকার করে আছে। সেই ২৯ বছরের কবি পদ্মার নৌকায় বসে বিস্মিত হয়ে লিখেছিলেন : "পৃথিবী বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়।" এই মুগ্ধতা ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতা, ছোটগল্প, পত্রাবলিতে।

ছড়ার ছবি-র 'পদ্মায়' রচনাটিতে কবি শুরুতেই জানিয়ে দেন তাঁর নৌকা পদ্মার পাড়ে বাঁধা। অনুত্তম ভট্টাচার্য মনে করেন যে, কবির পদ্মাবোটে অবস্থানের "মধুর স্মৃতির ... প্রেরণা"য় এটি রচিত [অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০২ : ৩৪৪]। ভট্টাচার্য *ছিন্নপত্রাবলী*র তিনটি পত্র থেকে এর সাযুজ্য দেখিয়েছেন :

> ক. শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে বোট লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চর — ধূধূ করছে ... — কেবল মাঝে মাঝে এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায় —। (পত্র : ৩)
> খ. বেলায় উঠে দেখলুম চমৎকার রোদদুর উঠেছে এবং শরতের পরিপূর্ণ নদীর জল তল্-তল্ থৈ-থৈ করছে। ... ধানের ক্ষেত সুন্দর সবুজ এবং গ্রামের গাছপালাগুলি বর্ষার স্নানে সতেজ। (পত্র : ৩১)
> গ. এমন সুন্দর শরতের সকাল বেলা! ... সুন্দর বাতাস দিচ্ছে এবং পাখি ডাকছে। ... এই আলো এবং এই বাতাস, ... গাছের পাতা এবং ধানের ক্ষেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন —। (পত্র ৬৯)।

কাব্যেও পাওয়া যায় একই সুর :

হাঁসের পাঁতি উড়ে যেত মেঘের ধারে ধারে— ...
... বালির 'পরে বয়ে যেত স্বচ্ছ নদীর জল,

তেমনি বইত তীরে তীরে গাঁয়ের কোলাহল —
ঘাটের গাছে, মাঠের ধারে, আলো-ছায়ার স্রোতে। ...
... তারই মধ্যে আসত ক্ষণে ক্ষণে
দূর কোকিলের সুর,
মধুর হত আশ্বিনে রোদ্দুর। ...
... ক্রমে রাত্রি নিবিড় হয়ে নৌকো ফেলত ঢেকে,
একটি কেবল দীপের আলো জ্বলত ভিতর থেকে।
শিকলে আর স্রোতে মিলে চলত টানের শব্দ, ...

এর বাইরেও পদ্মায় নৌকার মাঝি, নৌকাঘাটের ব্যবসা এবং পদ্মাপারের মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি ছবি আছে, যা *ছিন্নপত্র*, কাব্য বা ছোটগল্পে পাওয়া যায় না। পরদেশি পশ্চিমের হাট-বাজার থেকে মাঝিরা নানা ফসল নিয়ে আসত, দাঁড়ী খোরাক কেনার জন্য পথে থামত, দিনশেষে গ্রামের নৌকাঘাটে মাদল বাজিয়ে হোলির গান হতো — এ দৃশ্য তো আবহমান বাংলারই ছবি। বর্ষায় বদ্‌লে গেল 'পদ্মায়' বর্ণিত ঘাটের চিত্র। ইলিশ মাছ, কাঁঠাল, পাট কেনাবেচার ধুম, চাষির ঘরে কিছু স্বাচ্ছন্দ্য এল; ছাতা-জুতো, কেরোসিন ইত্যাদি কিনে "চলেছে ঘর-পানে"। আর পরদেশি নৌকাগুলো পাল উড়িয়ে ফিরে চলল।

১২ বছর বয়সে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে হিমালয় যাত্রার আমন্ত্রণ আর ৪ মাস হিমালয় বাস বালকের মনে কী অনির্বচনীয় আনন্দ ও বিস্ময় জাগ্রত করেছিল, তা রবীন্দ্র-স্মৃতিকথায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। পরিণত বয়সে হিমালয়কে স্মরণ করেছেন এভাবে :

হিমালয় গিরিপথে চলেছিনু কবে বাল্যকালে
মনে পড়ে। ধূর্জটির তাণ্ডবের ডম্বরুর তালে
যেন গিরি পিছে গিরি উঠিছে নামিছে বারেবারে
তমোঘন অরণ্যের তল হতে মেঘের মাঝারে ...
তুষার নিরুদ্ধবাণী বর্ণহীন, বর্ণনাবিহীন। ...
... সেই ছবিখানি রহিল স্মরণে চিরদিন মনোমাঝে।

সেবারে পিতাপুত্র ছিলেন ডালহৌসি পাহাড়ে বক্রোটা শৈলশিখরে বরফ আর পাইনবনের মধ্যে। কবি আলমোড়ার শৈলশিখরে প্রথম গিয়েছিলেন ১৯০৩ সালে; *শিশু*-র অধিকাংশ কবিতা সে সময়ে লেখা। ১৯১০-এ হিমালয়ের ছোট্ট জনপদ তিনধরিয়ায় ছিলেন ৩ সপ্তাহ। এছাড়াও হিমালয়ের চারপাশের গিরিঅঞ্চল দার্জিলিং (১৮৮২, ১৯৩১, ১৯৩৩); শিলঙ্ (১৯২৭); কালিম্‌পঙ্ (১৯৩৮, ১৯৪০), মংপু (১৯৩৮, ১৯৩৯) প্রভৃতি স্থানে গ্রীষ্ম ও পূজা-অবকাশে বহুবার বাস করেছেন কবি।

ছড়ার ছবি হিমালয়ের পাশে বসে লিখলেও এতে হিমালয় নিয়ে লেখা মাত্র একটি — 'খেলা'। স্মর্তব্য যে, এর প্রায় তিন যুগ আগে আলমোড়ায় বসে লেখা *শিশু* কাব্যেও হিমালয় বা পর্বত অনুপস্থিত। 'খেলা'র প্রথম স্তবকে উল্লেখ আছে পাহাড়ী ঝর্ণা ও প্রাচীন শালগাছের। দ্বিতীয় স্তবকে কুয়াশায় ঢাকা পর্বতের ছবি যা বৃষ্টি ও সকালের রোদে অবগুণ্ঠনমুক্ত হয়। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় কবির দীর্ঘস্মৃতির হিমালয় অজানাই থেকে যায়। সৈয়দ মুজতবা আলী লক্ষ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে পাহাড়ের বর্ণনা স্বল্প সৈয়দ

মুজতবা আলী ১৩৭১ : ৩৫]; কেননা "কবিগুরু বাঙালীর অচেনা জিনিস বর্ণনা করতে ভালোবাসতেন না"।

'চড়িভাতি'তে বনভোজনের যে বিবরণ তা অত্যন্ত বাস্তব; নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত। তবে কবি শৈশব-কৈশোরে কখনো পল্লিগ্রামে বাস করেননি। ১১ বছর বয়সে কয়েকদিন গঙ্গার ধারে পানিহাটির বাগানবাড়িতে ছিলেন। তখন গঙ্গার ধারে মোরান সাহেবের বাড়ি ও বাগানের স্মৃতি পাওয়া যায় কবির জবানিতে : "ঐ মোরান-বাগানের কথায় মনে পড়ে এক-একদিন রান্নার আয়োজন বকুলগাছতলায়" [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ১৩ : ৭৩৩]। পরের বছর হিমালয় যাত্রার পথে বাবার সঙ্গে কদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। আরও পরে কবির স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বাসকালে নিকটবর্তী গোয়ালপাড়া গ্রামের অতীতকাল থেকে সে-সময় পর্যন্ত বনভোজনের স্মৃতির উল্লেখ পাওয়া যায় শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের পরিচিতিমূলক গ্রন্থে [অনাথনাথ দাস ১৯৯৩ : ৬০]। ধরে নেয়া যায়, 'চড়িভাতি'র বিবরণ কবির পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

গাঁয়ের প্রান্তে মাঠের ধারে ডুমুরতলায় বনভোজনের আমন্ত্রণ। কাছে বটের গাছের ফল খেতে আসত ঝাঁক ঝাঁক পাখি। পাশে পুরোনো ঘাসের ওপর আমবাগান, গাঁঠ-পাকানো শিকড়ওয়ালা জামগাছ — তার তলায় শুয়ে গল্পের বই পড়ছে কেউ। শোনা যাচ্ছে ঘুঘুর ডাক; কাক ও কুকুরের আনাগোনা, হাট-ফেরতা গরুর গাড়ি; আকাশে হালকা সাদা মেঘ। চাল, ডাল, মসলা নিয়ে এসেছে সবাই; কেউ বা হাসের ডিম। রান্নার জন্য আমবাগানের কাঠ আর পানি যোগাড়ের ব্যস্ততা। উল্লেখ্য যে, জোড়াসাঁকোর বাড়ির পার্শ্ববর্তী বটগাছটি রবীন্দ্রস্মৃতিতে সমুজ্জ্বল :

ক. পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ৯ : ৪১৫]

খ. আমাদের ঐ বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ১৩ : ৭৩৬]

অন্যদিকে চড়িভাতির মধ্যে কবি খুঁজে পান আদিম সমাজজীবনের রেশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন মহর্ষির সঙ্গে প্রথম শান্তিনিকেতন যান (১৮৭৩) তখন বোলপুর এক "নগণ্য গ্রাম। ... দূরে ভুবনডাঙা গ্রামের বাঁধ, তালের সারিতে ঘেরা — এখন সে তালগাছ একটাও নেই" [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৯৫ : ১০]। কিন্তু কবির স্মৃতিতে তালগাছ ফিরে এসেছে একাধিকবার। এর মধ্যে *শিশু ভোলানাথ*-এর "তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে" (কার্তিক ১৩২৮) সুপরিচিত। *ছড়ার ছবি*-র ১৮ চরণের 'তালগাছ' (আলমোড়া, ১৩.৬.১৯৩৭) রচনার প্রথম ৮ চরণ আমগাছের বিবরণ — বেড়ার মধ্যে চিকন পাতার আমগাছ হাওয়ায় দুলছে, তার শ্যামল ছায়ার নিচে গরু চরছে। এর বিপ্রতীপে উপস্থাপন করেছেন বেড়ার ওপারের তালগাছকে, যার পাতার নাচ আকাশ ছুঁতে চায়; তার দৃষ্টি আকাশের তারার দিকে, মাটির দিকে নয়। *শিশু ভোলানাথ*-এর তালগাছও *বলাকা*-র তরুশ্রেণির মতো ডানা মেলে উড়ে যেতে চায়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মা-মাটির কাছে ফিরে

আসে। ১৬ বছর পরে লেখা 'তালগাছ' উড়তে চায়নি; কিন্তু তার দৃষ্টি ঊর্ধ্বমুখী, মাটির কথা ভাবে না। বর্তমান শান্তিনিকেতনবাসী কেউ কেউ মনে করেন যে, শান্তিনিকেতনে উপাসনা-মন্দিরের পিছনে যে তালগাছটিকে বেষ্টন করে পুরোনো দিনের শিক্ষক তেজেশচন্দ্র সেনের বাসগৃহ 'তালধ্বজ' তৈরি হয়েছে, সেটিই আলোচ্য তালগাছ। আম্রকুঞ্জ এবং তার মধ্যে গরু চরার দৃশ্যও এর চেয়ে খুব বেশি দূরে নয়।

খ.

ছড়ার ছবি-র একগুচ্ছ রচনা মূলত নৌকাযাত্রা ও নদীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। 'জলযাত্রা, 'ঘরের খেয়া', 'রিক্ত', 'ঝড়' ও 'অজয় নদী'তে নদী, নৌকাযাত্রা, মাঝি এবং নদীর চারপাশের জীবনই মুখ্য উপজীব্য। ইতঃপূর্বে আলোচিত 'পদ্মায়' রচনাটিও নৌকা, নদী, ঘাট ইত্যাদিকে ভাস্বর করেছে। কিন্তু তাতে কবির নৌকা স্থির; মনে হয় নৌকার ওপর বসে বা নৌকার খড়খড়ি দিয়ে চারদিক দেখছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম নৌকা দেখেছিলেন পানিহাটির বাগানবাড়ি থেকে; ১১ বছরের বালকসহ ঠাকুর পরিবার সেবার ডেঙ্গুজ্বরের আতঙ্কে জোড়াসাঁকো ছেড়েছিলেন। বাগানবাড়ি থেকে পেয়ারা গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা মাঝ-গঙ্গায় পালতোলা নৌকার ছবি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। স্মৃতিকথায় পাওয়া যায় :

ক. গঙ্গার ধারে প্রথম যে বাসা আমার মনে পড়ে, ছোটো সে দোতলা বাড়ি। নতুন বর্ষা নেমেছে। ... মনে পড়ে, থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা লাগছে গাছগুলোর মাথার উপর, ঝুটোপুটি বেধে গেছে ডালে-পালায়, ডিঙিনৌকাগুলো সাদা পাল তুলে হাওয়ার মুখে ঝুঁকে পড়ে ছুটেছে, ঢেউগুলো ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে ঝপ ঝপ শব্দে পড়ছে ঘাটের উপর। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ১৩ : ৭৩৩]

খ. ... গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। পাল-তোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনাভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত ...। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ৯ : ৪২৭]

তারপর ৩০ বছর বয়সে শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসরের জমিদারির দায়িত্ব নেবার পর নৌকায় কেটেছে বহু দিন-রাত। দিনের পর দিন নৌকাই ছিল তার বাসগৃহ; এমনকি দু'সপ্তাহের কাশ্মীর বাস (১৯১৫) বা কয়েকদিনের ঢাকা সফরেও (১৯২৬)। বর্ষার নদী, শরতের নদী, শীতের নদী; শান্ত নদী, প্লাবিত নদী, ঝড়ের নদী — সবই ছিল কবির অতি চেনা। ২০ বছর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কাদম্বরীর চন্দননগরের বাড়িতে বাসকালে গঙ্গাতীর ও নদীর নতুন রূপ কবির চিত্তে উদ্ভাসিত হয় : "সেই সময় আমি প্রথম অনুভব করেছিলুম যে, বাংলাদেশের নদীই বাংলাদেশের ভিতরকার প্রাণের বাণী বহন করে" [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৯৫ : ২৩]। অনেক পরে ৬১ বছর বয়সে পৌষ-উৎসবের পর পদ্মাতীরে বাসকালে ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁর নদীপ্রীতির কারণ: "আমরা যে ডাঙার উপর বাস করি সে ডাঙা তো নড়ে না। নদীর জল দিনরাত্রি চলে, তার একটা বাণী আছে। এইজন্য নদীর সঙ্গে আমার এত ভাব" [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৯৫ ; ১১৯]।

ছড়ার ছবি-র 'জলযাত্রা' (আলমোড়া, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪) প্রকৃতপক্ষে নৌকায় দু'দিনের ভ্রমণ-কল্পনা। কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যে মেঘ যেমন যাত্রাই করেনি, অথচ সমস্ত ভ্রমণের বিবরণ বর্ণিত হয়ে গেছে — 'জলযাত্রা'য়ও তাই। এর আরম্ভ মাঝিকে হাঁকডাকের মধ্য দিয়ে; শীতের দিন, বেলা থাকতে মহেশগঞ্জ পৌঁছাতে হবে। ক্ষেতে নতুন কলাই উঠেছে, পাশের গাঁয়ে ভাগ্নে বলাইর আড়তে তা বিক্রি করবেন। সেখান থেকে তিনপোয়া দূরত্বের যদুঘোষের দোকান থেকে খইয়ের মোয়া কিনবেন। তারপর মুন্সিপাড়া দিয়ে চন্দনীদ পেরিয়ে মালসী পৌঁছাবেন; সেখানে পুঁটকিদের বাড়িতে দুপুরের খাবার সেরে নেবার ইচ্ছে। আবার যাত্রায় হাওয়া পালের অনুকূল হলে এক প্রহরে মুখ্‌লুচরের ঘাটে পৌঁছা সম্ভব এবং সন্ধ্যানাগাদ খড়কেডাঙার হাট। নওয়াপাড়ায় পিসির ঘরে রাত কাটিয়ে সকালে শুকতারা ওঠার সঙ্গে আবার যাত্রা। জোয়ারে দ্রুত উজিরপুর পৌঁছে স্নান সেরে বালিতে ধুতি শুকিয়ে নিয়ে ভজনঘাটা পৌঁছা এবং সেখানে বেগুন, পটল, মুলো, সজনেডাঁটা কেনা। আটবাঁকে যখন পৌঁছবেন তখন মধ্যদুপুর; বকুলতলায় রান্না করে কলার পাতায় ভাতের সঙ্গে ঘি মাখিয়ে মধ্যাহ্ন-আহার। বিকেলে মাখনগাঁ আর সন্ধ্যায় বাঁকদিঘির ঘাটে পৌঁছে 'জলযাত্রা' সমাপ্ত হবে।

'জলযাত্রা'-র এ-ভ্রমণ নদীমাতৃক কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের একটি নিরেট বাস্তব বর্ণনা। নেপাল মজুমদার এর মধ্যে দেখতে পান চাষিদের গঞ্জের হাটে বেচাকেনার বাস্তব দৃশ্য যা "কাব্য ও শিল্পরসে ভরা" [নেপাল মজুমদার ১৯৯১ : ১৫১]। ভ্রমণের পাশাপাশি আবহমান বাংলার দিন-রাতের আবহ ও প্রকৃতির পরিবর্তনও এ-রচনায় প্রত্যক্ষ। পাল উড়িয়ে নৌকা চলা, রাতের তিন পহরে শেয়ালের ডাক, ঝাউগাছের ফাঁকে শুকতারার উদয়, প্রত্যুষে বাঁশের বনে কাকের ডাক, উঁচু বাড়ির আড়ালে চাঁদ ডুবে যাওয়া, শিরীষ গাছের পাতার শব্দ, মন্দিরা বাজিয়ে বোষ্টমীর নাম-গান, হাঁসের জলকেলি, মহিষের পাঁকে ডুবে থাকা, বকুলতলায় কোকিলের ডাক, ঝাউ-ঝোপের আড়ালে সূর্য ডোবা, গোধুলি লগ্নে ঘরে-ফেরা গরুর হাম্বারব — রবীন্দ্রনাথের কালে বাংলার গ্রাম তো এমনই ছিল। *শিশু* কাব্যের 'নৌকাযাত্রা' (আলমোড়া, জুলাই/আগস্ট ১৯০৩)-য় মধুমাঝির নৌকাকে মুহূর্তে ময়ূরপঙ্খীতে রূপান্তর, সাত সমুদ্র তের নদী, তেপান্তরের মাঠ ইত্যাদি মিলে রূপকথা ও ছড়ার আবহে যে কল্পভ্রমণ, 'জলযাত্রা'-য় তার কোনো রেশ নেই। ঘটনা অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তমপুরুষে বক্তা এবং মাঝি একাকার হয়ে গিয়েছেন। তাই নৌকার মাঝির জীবনের একটি ছবিও যেন অঙ্কিত হয়েছে 'জলযাত্রা'-য়।

'ঘরের খেয়া' (আলমোড়া, ২৮.৫.১৯৩৭) প্রত্যক্ষভাবেই একজন মাঝির গল্প। সন্ধ্যা নামছে, গাঙের মাঝখানে মাঝির নৌকা বাঁধা। দূরে তাঁর গ্রামের কুটিরের আভাস দেখা যায়। শ্রাবণ-ভাদ্রের বর্ষা শেষ হয়েছে, কিন্তু ফসলের ক্ষেত তখনও প্লাবিত। আশে-পাশের নৌকা ফিরে যাচ্ছে গাঁয়ের পানে, আকাশে হাঁসের দল হিমালয়ের দিকে। কিন্তু গল্প বা ঘটনা বেশি অগ্রসর হতে পারেনি; তার আগেই কবির দার্শনিক চিন্তা 'ঘরের খেয়া'র ভাবনাকে আবৃত করে ফেলে। অনুত্তম ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণ অনুসারে এতে লক্ষ করা যায় সীমা-অসীমের গভীর ব্যঞ্জনা [অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০২ : ৩৩৯]। শুদ্ধসত্ত্ব বসুর বিবেচনায় এর মূল কথা অন্তরের মধ্যে নিজের স্থান সন্ধানজাত উপলব্ধি [শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৩৭৩ : ২৩৪]।

'ঘরের খেয়া'র তুলনায় "ঝড়' একটি নৌকার ঝড়ে পড়ার বাস্তবচিত্র। দীর্ঘ নৌকাযাত্রা ও নৌকাবাসে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই নানা সময়ে ঝড়ের মধ্যে পড়েছিলেন। একবার নৌকায় গঙ্গা পার হবার সময় জলে পড়ে গিয়েছিলেন [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৯৫ : ১০৯]। চরে বাসের অভিজ্ঞতার কথাও তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায় যা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ঝড়'-এ দেখি :

... নামল বুঝি ঝড়,
ঘাটের পথে বাঁশের শাখা ওই করে ধড়ফড়। ...
ঢেউয়ের গায়ে ঢেউগুলো সব গড়ায় ফুলে ফুলে,
পুবের চরে কাশের মাথা উঠছে দুলে দুলে।
ঈশান কোণে উড়তি বালি আকাশখানা ছেয়ে
হূ হূ করে আসছে ছুটে ধেয়ে।
কাকগুলো তার আগে আগে উড়ছে প্রাণের ডরে,
হার মেনে শেষ আছাড় খেয়ে পড়ে মাটির 'পরে। ...
বিজুলি ধায় দাঁত মেলে তার ডাকিনীটার মতো, ...
ওইরে, মাঝি, ক্ষেপল গাঙের জল, ...

এই বিপদ থেকে রক্ষার জন্য "লগি দিয়ে ... চরের কোলে" নৌকা ঠেকাতে হবে। এর পরের অংশ নদীর চরের জীবনধারার বর্ণনা। চরের আশেপাশের পলিমাটিতে সবুজ ঘাস উঠেছে, জলে চখাচখীর বাস, চরের প্রান্তে "বালুতে রোদ পোহায় কচ্ছপেরা"। জেলেরা বাঁশ টাঙিয়ে জাল শুকায়; পাল সেলাই করে "ডিঙির ছাতে বসে বসে"। সেই চরে রান্না করে খেয়ে রাত কাটিয়ে কাক ডাকা ভোরে ইঁটেখোলার মেলায় যাত্রা করা যাবে। "প্রতি পঙ্‌ক্তিতেই এক একটি আলগা ছবি" [শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৩৭৩ : ২৩৪] তৈরি করে কবি যেন পূর্ব বাংলার নদীমাতৃক জীবনধারার একটি বিশেষ দিককে চিহ্নিত করেছেন।

'অজয় নদী' [আলমোড়া, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪] শান্তিনিকেতনের অজয় নদীর স্মৃতিবিজড়িত। অজয় নদীর সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয় ১১ বছর বয়সে; এ-রচনাটি তার ৬৫ বছর পরের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নন্দলাল বসু উভয়েরই দীর্ঘ স্মৃতি রয়েছে অজয় নদীকে ঘিরে। ৬৫ বছরে অজয় নদী অনেক ক্ষীণ হয়ে গেছে; নদীর সে প্রাণহারানোর গল্পই রয়েছে এ-রচনায়। "এককালে এই অজয় নদী ... স্রোতের প্রবল বেগে পাহাড় থেকে ... চিকন-চিকন বালি" আনত। সেই বালিই হরণ করে নিল নদীকে, নদী গেল বালির পেছনে সরে। কেবল বর্ষা নামলে নদী পূর্বরূপ ফিরে পায়; কিন্তু শরৎ এলেই হারিয়ে ফেলে আপন সুর। কবির আক্ষেপ —

চাঁদের কিরণ পড়ে যেথায় একটু আছে জল
যেন বন্ধ্যা কোন্ বিধবার লুটানো অঞ্চল।
নিঃস্ব দিনের লজ্জা সদাই বহন করতে হয়,
আপনাকে হায় হারিয়ে-ফেলা অকীর্তি অজয়।

নদীর স্রোত রুদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং পরিবেশের বিপর্যয় নিয়ে এখন পৃথিবীব্যাপী তোলপাড় চলছে। নদীর মৃত্যু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়েছিলেন প্রায় শতবর্ষ আগে। শরতে শিউলি

আর কাশের দোলার পাশে নদীর "শুষ্ক বুকের" প্রসঙ্গ একই সঙ্গে কবির মনোবেদনারও প্রকাশ।

'রিক্ত' (আলমোড়া, ১০.৬.৩৭) রচনাটিও নদীকে কেন্দ্র করে রচিত। জ্যৈষ্ঠ মাসে বেলা দুটোর সময় আঁকা (২.৬.১৯৩০) নন্দলাল বসুর স্কেচের প্রান্তে তুলিতে লেখা রয়েছে : "আগুনের মত ঝড় হাওয়া বইছে/শুকনা পাতাগুলা এলমেল ঘুরছে/দূরে সাঁওতালদের একটা গ্রাম/দেখা যাচ্ছে। দরজা বন্ধ করে বসে আছি"।

শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী সাঁওতাল পল্লির পাশের কোপাই নদীর বর্ণনাও হতে পারে; আবার অজয় নদীর প্রসঙ্গ হওয়াও অসম্ভব নয়। নদীর বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে "বালির মধ্যে ... অল্প জলের ধারার নদী"। ঘাট নেই, গ্রাম নেই, গাছের ছায়া নেই। শুধু চোখ-ধাঁধানো তাপ, শুষ্ক বালুর স্তূপে রুক্ষ হাওয়া। বৈশাখে বালুর ঘূর্ণিঝড় ওঠে, শরতে ফোটে কাশ। শুধু বর্ষায় দূরের পাহাড় থেকে জলস্থল একাকার করে স্রোত নামে; সবেগে বয় দমকা হাওয়া। এই বিবরণের সঙ্গে 'অজয় নদী'র তেমন পার্থক্য নেই।

'রিক্ত'-এ রবীন্দ্রনাথ খুব সম্ভবত পূর্ব বাংলার নদীর বিপ্রতীপে কথিত নদীর শূন্যতাকে তুলে ধরেছেন। কবি অনুভব করেছেন এর স্রোতে "'সামাল', 'সামাল' ক'রে" নৌকা "ছুটে আসে না"; মেঘের ডাক ও বৃষ্টিধারার মধ্যে "ধেনুর হাম্বারব" শোনা যায় না; "ক্ষেতের মধ্যে ... ঘোলা স্রোতের জল ... শ্যাওলাপানার দল "ভাসিয়ে আনে না"; রাতে "তীরে তীরে প্রদীপ জ্বলে না"। পদ্মার স্মৃতিতে ঋদ্ধ কবির মনে হয় — "দিগ্‌বধূ রয় অবাক হয়ে বৈরাগিণীর রূপে"। *পুনশ্চ*-এর 'কোপাই' কবিতাটিও কবি শুরু করেছিলেন পদ্মার বিপ্রতীপে — "পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়"। তাতেও বর্ষায় নদীর "মাতলামি"র প্রসঙ্গ আছে। কোপাই বীরভূম থেকে উদ্ভূত দাঁড়কার শাখানদী। কিন্তু 'রিক্ত'-এর নদীর জলের উৎস দূরের পাহাড়। সাঁওতাল পল্লির কোনো আভাস এতে নেই। এসব বিবেচনায় এই নদীও অজয় নদী হতে পারে। *পুনশ্চ*-এর 'কোপাই' কবিতা প্রসঙ্গে ক্ষুদিরাম দাস মন্তব্য করেছিলেন যে, "নিসর্গ বিষয়ে কবির কিছুটা নূতনতর দৃষ্টিকোণের পরিস্ফুট পরিচয় বহন করছে। কিন্তু ... কবির আগ্রহ-অভিলাষের পরিবর্তন যে পরিমাণে ঘটেছে, খাঁটি বাস্তব মনোভঙ্গি যে পরিমাণে প্রসারিত হয়েছে কিনা সন্দেহ [ক্ষুদিরাম দাস ১৯৯৪ : ২৩৪]। এই খাঁটি বাস্তব মনোভঙ্গির প্রকাশ *ছড়ার ছবি*-র প্রকৃতিকেন্দ্রিক রচনাগুলো।

গ.

ছড়ার ছবি-র একগুচ্ছ রচনাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে পদ্য-আঙ্গিকে গল্পবলা। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গ্রন্থের 'শনির দশা', 'যোগীন দা', 'কাশী', 'মাকাল' প্রভৃতিতে "স্বল্পপরিসর কাহিনীর ... মধ্যে করুণ, ... হাস্যরস" ইত্যাদির উপস্থিতি লক্ষ করেছেন [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪০১ : ৯৯]। সুকুমার সেনও উল্লেখ করেছেন যে গ্রন্থের "কয়েকটি রচনায় গল্পখণ্ড আছে, কয়েকটি রচনায় পুরোপুরি গল্পও আছে" [সুকুমার সেন ১৯৯৬ : ৩০৭]। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য একেই অভিহিত করেছেন "গল্প-চিত্ত" অভিধায় [উপেন্দ্রনাথ ১৪০৪ : ৭২২]।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শৈশবে ভৃত্যরাজকতন্ত্রের আসরে গল্পশোনার স্মৃতি সমুজ্জ্বল। কিশোরী চাটুজ্জের লব-কুশের গল্প কবিকে মোহিত করেছিল। *ছড়ার ছবি*-র দুটি গল্পের কথক যোগীন দা'র গল্পের আসরের যে বর্ণনা, সেটি আসলে কবির শৈশবের ঠাকুরবাড়ির গল্পের আসর — সেটি আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। বাংলার আবহমান লোককথার গল্পকে প্রবহমান রাখার জন্য কবি অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ক্ষীরের পুতুল* (১৮৯৬), শোভা দেবীর *The Orient Pearls* (১৯১৫) প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের লোককথা-প্রীতির ফসল। কিন্তু কবির বরাবরের আশঙ্কা ছিল "মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে" রূপ দিতে গিয়ে "সেই বিশেষ ভাষা বিশেষ রীতি" অক্ষুণ্ন থাকে কীনা? — কথাটি কবি প্রকাশ করেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের *ঠাকুরমার ঝুলি*-র ভূমিকায় (১৯০৭)। যোগীন দা'র গল্পকে কবি যখন *ছড়ার ছবি*-তে উপস্থাপন করছেন তখনও তাঁর দ্বিধা :

> গল্পটুকু দিচ্ছি, কিন্তু দেবার শক্তি নাই তো
> বলার ভাবে যে রঙটুকু মন আমাদের ছাইত।

আসর জমানোর জন্য যোগীন দা ঘুষ দিতেন লজঞ্চুস, মার্বেল, ছাঁচি পান, গণেশের ছবি ইত্যাদি। নিজে নিতেন কেয়া-খয়ের, কাসুন্দি, জারক লেবু। জারক লেবু ও কেয়াখয়েরের প্রসঙ্গ অবশ্য রবীন্দ্র স্মৃতিকথায় পাওয়া যায় এভাবে :

> বাড়ি-ভিতরের এই ছাদটা ছিল আগাগোড়া মেয়েদের দখলে। ... ওখানে রোদ পড়ত পুরোপুরি, জারক নেবুকে দিত জারিয়ে। ... কেয়াখয়ের তৈরি হত সাবধানে, ... ইস্কুলের পণ্ডিতমশায় আমাকে জানিয়ে দিলেন আমাদের বাড়ির কেয়াখয়েরের নাম তার শোনা আছে। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ১৩ : ৭২৪]

'যোগীন দা' (আলমোড়া, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪)-র কথকের পুরো নাম যোগেন্দ্র হালদার; এটি *ছড়ার ছবি*-র মুদ্রিত পাঠে নেই, তবে মূল পাণ্ডুলিপিতে ছিল [অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০২ : ৩৩৯]। তাঁর জন্ম সীমান্ত প্রদেশের ডেরাসমাইলখাঁয়; মিলিটারি জরিপে চাকুরির সুবাদে পশ্চিম ভারতের অনেক শহর-গাঁয়ে ঘুরেছেন। বয়সে ৬০ পেরিয়েও "মুগুর-ভাঁজা দেহ" শক্ত — চওড়া কপাল, মাথায় বিরল চুলের টাক, গোঁপ নিয়ে অ-থল্‌থলে মুখ, ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি।

যোগীন দার প্রথম গল্পের শুরুতে তিনি রেলভ্রমণে বেরিয়েছেন। ছন্দৌসির গাড়ি হুশিয়ারপুর পেরিয়ে রাত দেড়টায় সর্‌হরোয়া স্টেশন থেকে ছাড়ল। ভোর না হতেই পার হলো বুলন্দশর, আম্লোরিসর্সার, প্রভৃতি। ফিরোজাবাদ পৌঁছে খিদে মেটাতে স্টেশনে নেমে যোগীন দা যখন "ঠোঙায়-ভরা পকৌড়ি আর মটর-ভাজা" খাচ্ছিলেন, ঠিক তখন "পাঁচশো-সাতশো লোকলস্কর, বিশ-পঁচিশটা হাতি ... ঝালর-দেওয়া প্রকাণ্ড ... ছাতি নিয়ে স্টেশনে উপস্থিত জৌনপুরের রাজা। মন্ত্রী এসে যোগীন দাকে "যুবরাজ" সম্বোধন করে মাথায় তাজ পরিয়ে দিলেন।

এই নাটকীয় ঘটনার কার্যকারণসূত্রের ব্যাখ্যা গল্পের দ্বিতীয় অংশে। জৌনপুরের যুবরাজ ১৩ বছর আগে সদ্য বিয়ে করে নাথদোয়ারার সেগুনবনে শিকার করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। তাঁর খোঁজ শুরু হয় — পিণ্ডিদাদনখাঁ, লালমুসা, লুধিয়ানা, গুলজারপুর,

রাওলপিণ্ডি — কোথাও পাওয়া যায় না। ওদিকে "কেঁদে কেঁদে অন্ধ হল রানীমায়ের চোখ"। এরই মধ্যে রেলভ্রমণরত যোগীন দা "খোলা গায়ে ... মিঠে হাওয়া" লাগিয়ে হাৎরাশ জংশনে পাউরুটি খাচ্ছিলেন। জৌনপুরের চর তাঁকে "রাজাসাহেব" সম্বোধনে পরিচয় জানতে চায়। যোগীন দা "জম্‌কালো" সম্মানের লোভে আসল পরিচয় গোপন করেন। তারই পরিণতিতে ৫ মাস পরে এই ঘটনা। আফগান-শিখা-গুর্খা ফৌজ সালাম করে উর্দু-ফার্‌সিতে জয়ধ্বনি দিয়ে ইটার্সি, মৈনপুরী, লছ্‌মন-ঝোলা, ভাটিণ্ডা হয়ে ময়ূরপঙ্খি দোলায় তাঁকে নিয়ে গেল জৌনপুর।

কিন্তু 'তিনটে দিন না যেতে যেতেই ... গলদ্‌ঘর্ম" হয়ে উঠলেন যোগীন দা :

রাজপুত্র হওয়া কি, ভাই, যে সে লোকের কর্ম?
মোটা মোটা পরোটা আর তিন-পোয়াটাক ঘি
বাংলাদেশের-হাওয়ার-মানুষ সইতে পারে কি?
নাগরাজুতায় পা ছিঁড়ে যায়, পাগড়ি মুটের বোঝা —
এগুলি কি সহ্য করা সোজা?
তা ছাড়া এই রাজপুত্রের হিন্দি শুনে কেহ
হিন্দি বলেই করলে না সন্দেহ।

তারপর দূর শহরের রামলীলার কারণে ঢিলা পাহারা —

সেই সুযোগে গৌড়বাসী তখনি এক দৌড়ে
ফিরে এল গৌড়ে।
চলে গেল সেই রাত্রেই ঢাকা ...।[২]

সুকুমার সেন মনে করেন যে, "পশ্চিমের ভূগোল ও ইতিহাস লইয়া যে ঘট পাকানো" হয়েছে, তা এর ঘটনাকে চিত্তাকর্ষক করেছে। সেনের মতে, যোগীন দা *ছড়ার ছবি*-র শ্রেষ্ঠতম রচনা (সুকুমার সেন ১৯৯৬ : ৩০৭)। রবীন্দ্রনাথও অবশ্য ভূগোলের ঘটের কথা মানতেন — "ভূগোল হত উল্‌টো পাল্‌টা, কাহিনী আজগুবি"; কিন্তু তারপরও "আধেক রাত্রি ধরে/শহরগুলোর নাম যত সব মাথার মধ্যে ঘোরে"।

'কাশী'-ও (আলমোড়া ১০.৬.১৯৩৭) যোগীন দাদার গল্প। তখন তার বয়স ৮, থাকতেন খুড়ির সঙ্গে। খুড়ির মোরব্বার ব্যবসা — আমলকী, বেল, পেঁপে, চালতা, কাঁঠাল-বিচি সবকিছুরই মোরব্বা তৈরিতে সুনাম তার। এভাবে "কিঞ্চিৎ টাকা" জমলে রাতে চোর এসে জানলা দিয়ে টাকা চুরি করতে চায়। "খুড়ি তখন চাটনি করতে তেল নিচ্ছেন মেপে", সে-অবস্থায় চোরের হাতে জানলা চেপে দিলে কোনোমতে পালাল চোর। এখানে গল্প থামাতে চায় যোগীন দা; কিন্তু শ্রোতারা ছাড়তে নারাজ।

সুতরাং যোগীনদার দ্বিতীয় গল্প শুরু হলো, সেটিই কাশীর গল্প। কাশীতে ভীষণ ভিড়; ৮ বছরের যোগীনদাকে "বাড়ির দ্বারের পাশে" বসিয়ে "খুড়ি গেছেন স্নান করতে"। ভিড়ে যখন কণ্ঠাগত প্রাণ তখন এক গুণ্ডা বালককে কাঁধে তুলে নিলে মনে হলো "এ তো বিষ্ণুদূতের দয়া"। কিন্তু—

বিষ্ণুদূতটা ধরল যখন যমদূতের মূর্তি
এক নিমেষেই, একেবারেই ঘুচল আমার ফুর্তি।

সাত গলি পার হয়ে এক এঁদোঘরে নিয়ে "খড়ের আঁটির 'পরে" বসিয়ে রাখল তাকে, দাবি মুক্তিপণ হিসেবে খুড়ির ৫০০০ টাকা দিতে হবে। "দিন ... গেল কোনোমতে কড়ি বর্‌গা গুণে"। এর মধ্যে গুণ্ডা পাঁড়ের ভাগ্নি মামার সঙ্গে ঝগড়া করল এই অপকর্মের জন্য এবং রাত্রে অপহরণকারী মামার অজান্তেই যোগীনদাকে খুড়ির বাসায় রেখে আসল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৫৫ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ পূজাবকাশে গয়ায় গেলে (১৯১৫) "এক ধাপ্পাবাজ লোকের পাল্লায় পড়ে সারাদিন ট্রেনে ও পালকিতে" ঘুরতে হয়েছিল তাঁকে (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৯৫ : ৯৩)। উপর্যুক্ত গল্পের দ্বিতীয় অংশে এ-ঘটনার ছায়া থাকতে পারে। আবার রচনাটির একেবারে শেষদিকে "ঠিক এমনি গল্প বাবা শুনিয়েছে বই থেকে" মন্তব্য থেকে কী এমন অনুমান করা যায় যে, সে সময়ের কোনো প্রচলিত গল্প এটি?

'শনির দশা' (আলমোড়া ৪.৬.১৯৩৭) পড়ে ডন্ কুইকসট-এর কথা মনে হয়েছে প্রভাতকুমারের [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪০১ : ৯০]। শুদ্ধসত্ত্ব বসুও "গম্ভীর চালে লেখা ... প্রচ্ছন্ন হাসির রসে ভরা ... নাটকীয় চমকের মধ্যে ... উন্মোচন এবং সমাপ্তি"-তে মুগ্ধ হয়েছেন [শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৩৭৩ : ২৩৯]।

'শনির দশা'র গল্পাংশের মুখ্য চরিত্র কোনো সরকারি দফতরের হিসাবরক্ষক "বুড়ো বারেক"। তার মেঝোমেয়ের খোকার অন্নপ্রাশন, "মাথার দিব্যি দিয়ে" মেয়ে উমারানী বাবাকে আমন্ত্রণ করেছে। বারেক ছুটির আবেদন করেছেন; কিন্তু অফিসে "মাস-কাবারের ... হিসাব লেখা বাকি", তাই ছুটি মঞ্জুর হয়নি। বারেক একবার ইস্তফা দেওয়ার কথাও ভেবেছেন; কিন্তু দোদুল্যমান মধ্যবিত্ত "আসন্ন পেনশনের আশা"য় নিজেকে সংযত করেছেন। "শেষকালে ... জাপানি ঝুম্‌ঝুমি" কিনে প্রতিদিন রেলস্টেশনে যান; কিন্তু দ্বিধা অতিক্রম করে ট্রেনে ওঠা হয় না। এমনি অবস্থায় কথকের সঙ্গে বারেকের দেখা। বুড়ো কথককে জানালেন, তিনি শনির দশায় আছেন; কিন্তু ঠিক করেছেন ঘোড়দৌড়ের বাজির টিকেট কিনবেন, কেননা টিকেট কিনতে কিনতে শনির দশা আর থাকবে না।

রচনাটিতে নন্দলাল বসুর যে-স্কেচ তার মুখমণ্ডল রবীন্দ্রনাথের আদলের। শুরুতে কবি বলছেন "আধবুড়ো ওই মানুষটি মোর নয় চেনা" এবং "মনে মনে আমি যে ওর মনের মধ্যে নাবছি"। স্কেচ এবং মন্তব্য মিলিয়ে কী বলা যায় যে এটি আত্মকৌতুক?

'মাকাল' (৮.১২.১৯৩১) রচনাটি *ছড়ার ছবি*-র অন্যান্য রচনার অন্তত অর্ধযুগ আগের। *সন্দেশ*-এর পৌষ ১৩৩৮ সংখ্যায় কবির হাতের লেখায় এটি মুদ্রিত হয়; এতে কোনো চিত্র ছিল না। আকালের বছরে জন্ম বালক শ্রীযুক্ত রাখালের; পড়ার দ্বিতীয় ভাগ শেষ করতেই নাকাল। গুরু তার নাম দিলেন মাকাল, তাতে আনন্দে নৃত্য করল সে। দাদা যখন বুঝালো যে, মাকাল নামটি নিন্দার্থে, তখন দাদাকে পুকুরপাড়ে নিয়ে বেড়ার ওপরে মাকাল ফল দেখাল, যা তার কাছে 'সোনার চেয়ে মন্দ না'। মাকাল নামটি তাকে এমনই মোহাবিষ্ট করলে যে খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা ছেড়ে খাতার পাতায় লিখে চলে — মাকাল

চন্দ্র রায়। এই গল্পাংশটিও নির্মল কৌতুকে পূর্ণ। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সুকুমার রায়ের সম্পাদনাকালে *সন্দেশ*-এ এ-ধরনের রচনার প্রাধান্য ছিল।

'ভজহরি' (আলমোড়া, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪) হঙকঙ থেকে আনা চিনা শ্যামা পাখিকে উপলক্ষ করে বাংলার বনবাদাড়ের পাখি ও পতঙ্গের কাহিনী। গল্পে শ্যামা কবির মায়ের কাছে মামার পাঠানো পাখি হলেও এটি নিশ্চিতভাবেই কাদম্বরী দেবীর পালিত শ্যামা পাখির অভিজ্ঞতাভিত্তিক। *ছেলেবেলা*-য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> খাঁচার পাখি পোষার শখ তখন ঘরে ঘরে ছিল। সবচেয়ে খারাপ লাগত পাড়ায় কোনো বাড়ি থেকে পিঁজরেতে-বাঁধা কোকিলের ডাক। বউঠাকরুন জোগাড় করেছিলেন চীনদেশের এক শ্যামা পাখি। কাপড়ের ঢাকার ভিতর থেকে তার শিস উঠত ফোয়ারার মতো। আরো ছিল নানা জাতের পাখি। তাদের খাঁচাগুলো ঝুলত পশ্চিমের বারান্দায়। রোজ সকালে একজন পোকাওয়ালা পাখিদের খোরাক জোগাত। তার ঝুলি থেকে বেরত ফড়িঙ, ছাতুখোর পাখিদের জন্য ছাতু। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ১৩ : ৭২৯]

শ্যামার পালনের দায়িত্বে ছিল ভজহরি বা ভজু। নিচিনপুরের বন থেকে ফড়িং ধরে এনে শ্যামার সঙ্গে পাড়ার সব পাখিকে খেতে দিত ভজু; সঙ্গে দিত ছাতু, পোকা, ধান। "পোকার দেশে ... দত্যি" এই ভজু ফাগুন মাসে একদিন কথকের মাকে এসে খবর দিল, পরদিন গোধূলিতে তার মেয়ের বিয়ে। শুনে কথক তাজ্জব —

> এরও আবার মেয়ে আছে, তারও হবে বিয়ে
> রঙিন চেলির ঘোমটা মাথায় দিয়ে।...

কথকের ঔৎসুক্য "বিয়ের দিনে খুব বুঝি ধুম হবে?" উত্তরে ভজা জানায়, "খাঁচার রাজ্যে ... মান" রাখতে দাঁড়ের পাখি আর খাঁচার পাখি সকলকে "নেমন্তন্ন-চিঠিগুলো ... ডাকে" পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাদের খাদ্যতালিকায় থাকবে মোটা ফড়িঙ, ছাতুর সঙ্গে দই, জলভেজা ছোলা ইত্যাদি। লঙ্কা খাইয়ে ময়নার গলার কসরৎ বাড়ানো হবে; কাকাতুয়া চীৎকারে ডঙ্কা বাজাবে; পায়রা গলা ফুলিয়ে বক্‌বকম করবে; শালিক, কোকিল, চন্দনা আসর জমাবে; সঙ্গে থাকবে টিয়ের ডাক — এমন ধুম হবে যে সাত পাড়াতে কেউ ঘুমাতে পারবে না।

'ভজহরি'তে কবি যেন ভজার মধ্য দিয়ে বনবাদাড়ে পাখি আর পতঙ্গদের রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নিজেই। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাখিপ্রীতির কথা সুবিদিত। কবির জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯২৭ সালে কবির সঙ্গে গিয়েছিলেন ভরতপুর। তাঁর অভিজ্ঞতা :

> শহর থেকে দূরে বিশাল এক জলাশয় বা বিলের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম বলে কবিকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। জলে নানা জাতের অসংখ্য পাখি কলরব করছে; ভালোই লাগছে সবটা দেখে। কিন্তু হঠাৎ দেখেন একটা ফলকে কোন্ জঙ্গীলাট বা কোন্ সাহেব ক'হাজার করে পাখি মেরেছেন তার তালিকা। দেখে কবির মন এত ব্যথিত হল যে তিনি সেই মুহূর্তেই স্থানটি ত্যাগ করলেন। ... তাঁর [কবির] জমিদারির এলাকায় কোনো শিকারী, এমন-কি কোনো রাজকর্মচারি পাখি মারতে পেত না। [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৯৫ : ১৩৭]

ঘ.

ছড়ার ছবি-র ভূমিকায় ছন্দ ও ভাষা সম্পর্কে কবির অভিমতের পাশাপাশি ছড়ার বিষয়বস্তু, নিয়েও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ভাবনাকে স্পষ্ট করেছিলেন। তাঁর মতে :

> ছড়ার ছন্দটি যেমন ঘেষাঁঘেষি শব্দের জায়গা, তেমনি সেই সব ভাবের উপযুক্ত যারা অসতর্ক চালে ঘেষাঁঘেষি করে রাস্তায় চলে, যারা পদাতিক, যারা রথচক্রের মোটা চিহ্ন রেখে যায় না পথে পথে — যাদের হাটে মাঠে যাবার পায়ে চলার চিহ্ন ধুলোর উপর পড়ে আর লোপ পেয়ে যায়।

ছড়ার ছবি-র 'ভ্রমণী' (আলমোড়া, ২০.০৬.১৯৩৭)-তে কবি যেন তাঁর নিজের হৃদয়বেদনা দিয়ে শুরু করেছেন — মাটির সন্তান হয়েও শহরের "পোষ্যপুত্র" তিনি, চতুর্দিকে তাঁর "ইঁট-পাথরের আলিঙ্গনের ... আড়াল, ভ্রমণের তৃষ্ণা মেটাতে" "ছাদের উপর একা" বই পড়ে তাই পেতে হয় ভ্রমণকারীর দেখা। এবং এরই সূত্র ধরে কবি বন্দনা করেন সাধারণ মানুষের —

পলে পলে পার যারা হয় মাটির পরে মাটি
প্রত্যেক পদ হাঁটি —
নাইকো সেপাই, নাইকো কামান, জয়পতাকা নাহি—
আপন বোঝা বাহি
অপথেও পথ পেয়েছে, অজানাতে জানা,
মানে নাইকো মানা —
মরু তাদের, মেরু তাদের, গিরি অভ্রভেদী
তাদের বিজয়বেদী।
সবার চেয়ে মানুষ ভীষণ, সেই মানুষের ভয়
ব্যাঘাত তাদের নয়।
তারাই ভূমির বরপুত্র, তাদের ডেকে কই,
তোমরা পৃথ্বীজয়ী।

ছড়ার ছবি-র প্রায় সাড়ে তিন বছর পরে এবং মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে রচিত 'ঐকতান' (শান্তিনিকেতন, ২১.০১.১৯৪১) কবিতায়ও কবি ভ্রমণের কথা বলেছিলেন এভাবে :

... বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতিক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে ...

এবং এরই সূত্র ধরে বলেন :

সব চেয়ে দুর্গম-যে মানুষ আপন-অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।...
... চাষি ক্ষেত্রে চালাইছে হাল,
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।

এই সাধারণ মানুষদের কথা আছে *ছড়ার ছবি*-র অন্তত ৭টি রচনায় — 'পিসনি', 'খাটুলি', 'বুধু', 'দেশান্তরী', 'অচলা বুড়ি', 'সুধিয়া' ও 'মাধো'তে।

'পিস্‌নি' (আলমোড়া, ০৩.০৬.১৯৩৭) কিশোর-গাঁয়ের পুবপাড়ার বিধবা বৃদ্ধা। স্বামীর মৃত্যুর পর বাড়িতে "অদরকারি"; চোখ-মন-ঝাপসা এই অবহেলিত বৃদ্ধা একদিন রাতের বেলা কাঁথা আর ঝুলি নিয়ে গ্রাম ছেড়ে রেলস্টেশন অভিমুখে যাত্রা করল। উদ্দেশ্য আল্‌মডাঙা, সানকিভাঙা বা পাটনা হয়ে কাশী যাবে। তবে দূরদেশেও আত্মীয়দের কাছে আশ্রয় নিশ্চিত নয়; কেননা "নিজেরই ঝঞ্ঝাটে/তাদের বেলা কাটে"। তাই পিস্‌নি "পথের ধারে বসে পড়ে — শূন্যে থাকে চেয়ে"। এভাবে এক "গভীর অবোধ বেদনার" [দ্র. সুকুমার সেন ১৯৯৬ : ১৬১] চিত্র ফুটে ওঠে রচনাটিতে যদিও এর সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট অনেকটা অস্পষ্টই থেকে যায়। শুধু "ভগ্নশেষের সংসারে" পিস্‌নির "গভীর নিশাস" এক আদিগন্ত বিষণ্নতায় পাঠককে আচ্ছন্ন করে রাখে।

'খাটুলি' (আলমোড়া, ২৮.০৫.১৯৩৭) খাটুলির আত্মকথা নয়; ঘরের বাইরে খাটুলিতে বসে তামাক টানে এমন এক বৃদ্ধ কৃষকের কাহিনী। খাটুলির উপর বটের ছায়া, পেছনে নদী। ঘরের মধ্যে দারিদ্র্যের ছাপ — "আমের কাঠের নড়বড়ে এক তক্তপোশের" ওপর বিছানো "মেয়ের হাতের সেলাই করা কাঁথা"; সে মেয়েও বিধবা হয়েছে আর মৃত নাতনি স্মৃতি হিসেবে রেখে গেছে পোষা ময়না। এক ছেলে তালুকদারের পক্ষে দাঙ্গা করতে গিয়ে জেলে; ঘরের মাটির দেয়াল সে-ছেলের হাতে গাঁথা। আরেক ছেলে "গঙ্গাপারের দেশে" চাকরি করতে গিয়ে বছরের শেষে মারা গেছে। মেয়ের বিয়ের দেনা শোধ করতে গরুটা বিক্রি করতে হবে। এবছরে "তিসির বেচা-কেনায়" ক্ষতি হওয়ায় দেনায় ডুবেছে সে। ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছে; তবুও "বিচ্ছেদ নাই খাটুনিতে, শোকের পায় না ফাঁক —"।

কিন্তু তারপরও তার খাটুলিটার মতোই বিধ্বস্ত ও নিঃসঙ্গ এ-চরিত্র পরাজিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় —

> বাইরে দারিদ্র্যের
> কাটা-ছেঁড়ার আঁচড় লাগে ঢের,
> তবুও তার ভিতর-মনে দাগ পড়ে না বেশি,
> প্রাণটা যেমন কঠিন তেমনি কঠিন মাংসপেশী।

তার মধ্যে নতুন করে জীবনীশক্তির সঞ্চার করে খোলা আকাশ, বুলবুলির শিস দিয়ে নাচ, নদীর ধারের মেঠো পথ, ক্ষেতের ফসলের চক্ষু ভোলানো রং। 'খাটুলি'র মধ্যে কী কোনো ছায়া দেখা যায় প্রকৃতির স্নেহে আর জগদীশ্বরের প্রতি আস্থায় ব্যক্তিগত শোক ভোলার প্রবণতার, যা রবীন্দ্রনাথের জীবনে দেখতে পাওয়া যায়?

'বুধু' (আলমোড়া, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪) সাতপুরিয়া গ্রামের মোড়লের গল্প; গরুর গাড়ির ব্যবসা তার আয়ের উৎস। পরপর তিনটি নাতির মৃত্যুর পর তার আদরের নাতি মোগ্‌লুর জন্য "না খেয়ে, না প'রে" সব সঞ্চয় করছে সে। তার কৃপণতা এমন পর্যায়ে যে "সকালে

কেউ নাম করে না, উপোস পাছে ঘটে"। এই বর্ণনার মধ্যে কৌতুক আছে; কিন্তু দারিদ্র্যের প্রকট রূপ নেই। তবে রচনাটির শুরুতে সাতপুরিয়া গ্রামের দারিদ্র্য প্রত্যক্ষ — গ্রামে কাঁকুর তর্‌মুজ ছাড়া সাধারণ চাষাবাদের সুযোগ নেই, তৃণহীন শুকনো জমি, চারদিকে বালির ডাঙা, ছাগলের খাবার পর্যন্ত পাওয়া দুষ্কর। কৃষিজীবীর বাইরে ৩৫ ঘর তাঁতি এখানে জাজিমের ব্যবসা করে। রচনাটিতে বাংলার কৃষি ও গ্রামব্যবস্থার একটি বিশেষ দিক উদ্ভাসিত হয়েছে, যা রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার মধ্যেই ছিল।

'দেশান্তরী' (শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩৪৪) বিশ শতকের তিরিশের দশকের বাংলার সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনধারার একটি দলিল। বিশের দশকের শেষে ইউরোপের মহামন্দার পরে বাংলায় কৃষিপণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়। এর ফলে কৃষিমজুরদের এক বিরাট অংশ বেকার হয়ে যায়। যারা মজুরি পায় তাদের আয়ও এত সামান্য ছিল যে, ভারতীয় কিষাণ সভার মতে "তা একজন কয়েদির জীবনযাপনের জন্যও অপ্রতুল"। একাধিক সরকারি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বাংলায় সামগ্রিকভাবে দুর্ভিক্ষ না থাকলেও কিছু কিছু মানুষের জীবনধারণের পর্যায় দুর্ভিক্ষ-অবস্থার সমতুল্য। এটিই ছিল বাংলার আকালের প্রথম পর্যায়; যার চূড়ান্ত বিয়োগাত্মক পরিণতি ১৩৫০-এর মন্বন্তর।

এই আকালে বাংলার গ্রাম থেকে ছিন্নমূল কৃষক ও কৃষিমজুরেরা কাজের সন্ধানে দলে দলে শহরের দিকে যাত্রা করে। 'দেশান্তরী'র নামহীন নায়কেরও "দিন চলে না"; তাই "প্রাণ-ধারণের বোঝাখানা ... পিঠের 'পরে" নিয়ে দূর শহরে যাত্রা করবে। "দুর্গা ব'লে বুক বেঁধে ... ভাগ্যজয়ে"র যে যাত্রা, তা আমাদের 'যেতে নাহি দিব'-র যাত্রার[৩] কথাই মনে করিয়ে দেয় :

> মা ডাকে না পিছুর ডাকে অমঙ্গলের ভয়ে।
> স্ত্রী দাঁড়িয়ে দুয়ার ধরে দুচোখ শুধু মোছে,
> আজ সকালে জীবনটা তার কিছুতেই না রোচে।
> ছেলে গেছে জাম কুড়োতে দিঘির পাড়ে উঠি —
> মা তারে আজ ভুলে আছে, তাই পেয়েছে ছুটি।

কিন্তু এই যাত্রা 'যেতে নাহি দিব'-র কর্তার "পূজার ছুটির শেষে ... বহুদূর দেশে" নিশ্চিত "কর্মস্থলে" যাত্রা নয়। খেয়াঘাটে মাঝি এসেছে; দিন থাকতেই রহিমগঞ্জে পৌঁছতে হবে। সেখানে ওদের জ্ঞাতিসম্পর্কের "মহেশখুড়োর মেঝো জামাই, নিতাই দাসের নাতি" "চৌকিদারি করে"। তার আশ্রয় থেকে রওনা দিয়ে কোনোমতে শহরে পৌঁছতে লাগবে ৫ দিন। শহরের হালসিবাগানে ওদের গ্রামের কালু "সর্ষেতেলের দোকান চালাচ্ছে খুব ভালো"। তার কাছে পৌঁছতে পারলে "সব সহজ হবে" — এমনই আশা। কিন্তু কবি এবং পাঠক জানেন, একটি কাজ জুটিয়ে নেওয়া এত সহজ হবে না। স্ত্রী যতই প্রবোধ দিক এবং স্বাবলম্বী হওয়ার আশ্বাস দিক, বাস্তবে পুরো পরিবারটি থাকবে অনটন ও অনিশ্চয়তার মধ্যে। এরই সামষ্টিক পরিণতি বিধ্বস্ত গ্রামীণ অর্থনীতি, যা প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজাদের নিয়ে প্রতিকারে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন এবং নিজের বিত্ত ও শ্রমের বৃহদাংশ ব্যয় করেছিলেন।

কিষাণ-গৃহিণী বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, সংসারে নতুন অনটন শুরু হলো। কিন্তু বাংলার গৃহবধূ চায় না স্বামী দুশ্চিন্তায় থাকুক। তাই যাত্রার পূর্বে বার বার স্বামীকে আশ্বস্ত করছে – "ঘর ছাইতে খড়ের আঁঠির যোগান দেবে", "গোবর দিয়ে নিকিয়ে দেবে দেয়াল পাঁচিল মেঝে", "মাঠের থেকে খড়কে কাঠি এনে ... ঝাঁটা বেঁধে কুমোরটুলির হাটে" বিক্রি করবে, "বামুনদিদির ঘরে ... ঢেঁকিতে ধান ভেনে" "খুদকুঁড়ো যা জুটবে তাতেই চলবে দুর্বছরে"।

রবীন্দ্রনাথের এই সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক অধ্যয়নে বিস্মিত হয়েছেন নেপাল মজুমদার। তাঁর প্রশ্ন : "জমিদার-রবীন্দ্রনাথের পক্ষে গরিব চাষীপরিবারের বৌ-ঝিদের সুখ-দুঃখের খুটিনাটি এত সব গোপন কথা কি ভাবে জানা সম্ভব হইল" [নেপাল মজুমদার ১৯৯১ : ১৫৪]। এবং এই প্রশ্নের সূত্র ধরেই নেপাল মজুমদার নিজেই অনুধাবন করেন :

> গাঁয়ের নিঃস্ব গরিব চাষী-মজুরেরা কি দুঃসহ দারিদ্র্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া স্নেহময়ী জননী স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং আশৈশব মায়া-মমতায় ঘেরা গ্রাম ছাড়িয়া শহরের চটকলে ও বিভিন্ন কারখানার দরজায় কাজের জন্য ভিড় করিতেছে, কবি তাহা গভীর দরদ দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

'অচলা বুড়ি' (শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩৪৪)-র অচলাও পিস্‌নির মতো বৃদ্ধা বিধবা, বর্ণনাংশে এমন তথ্য না থাকলেও এটা প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু পিস্‌নির মতো পরাজিত-মনোভাব বা পলায়নপরতা অচলার মধ্যে নেই। মুখে হাসি, উজ্জ্বল চোখ, ফুলো গাল-ঠোঁট, পরিপুষ্ট অঙ্গ, মোটা গড়নের হাত, "কপালে দুই ভুরুর মাঝে উলকি-আঁকা ফোঁটা" এবং সর্বোপরি "উছলে পড়া হৃদয়" — কবির বর্ণনায় অচলার মূর্তি এরকম। গাড়ি-চাপায় রক্ষা পাওয়া এক খোঁড়া কুকুর আর বালেশ্বরের এক আধপাগলি ঝি ঘরে তার নিত্যসহচর।

ঘটনার প্রথম অংশে দেখা যায় স্যাঁৎরাপাড়ার কায়েতবাড়ির বাপের আদুরে মেয়ে বিয়ের পর বিধবা হয়েছে; এর মধ্যে মারা গেছে বাবাও। ভাইরা তাকে বাবার বাড়িতে ঠাঁই দেয় না। ক্ষুধার দায়ে কাজ নিল হাসপাতালের আয়া হিসেবে। গুটিকয় গ্রামবাসী ছাড়া সকলে বিধবার জাত গেল বলে "ছি-ছি করে"। কিন্তু অচলা বুড়ি বলে :

> ... তুই বেশ করেছিস যা বলুক-না যেবা,
> ভিক্ষা মাগার চেয়ে ভালো দুঃখী দেহের সেবা।

অচলার মানবিকতার বিপরীতে হিন্দুসমাজে জাত নিয়ে যারা হৈ-চৈ করে, এভাবে তাদেরকে হাস্যাস্পদ করে তুলেছেন কবি।

'অচলা বুড়ি'র দ্বিতীয় ঘটনাটি প্রত্যক্ষভাবেই জমিদারের অত্যাচারের চিত্র। রাই ডোমনির ছেলে গোষ্ঠ মিশনারি স্কুলে পড়ে কম্পোজিটরের কাজ শিখে ভাল আয় করে। ফলে যখন—

> জমিদারের মায়ের শ্রাদ্ধ, বেগার খাটার ডাক —
> রাই ডোমনির ছেলে বললে, কাজের যে নেই ফাঁক
> পারবে না আজ যেতে। শুনে কোতলপুরের রাজা
> বললে — ওকে যে ক'রে হোক দিতেই হবে সাজা। ...

... ছোটোলোকের ঘাড়-বাঁকানো চাল!
সাক্ষ্য দিল হরিশ মৈত্র দিল মাখনলাল—
ডাক-লুটের এক মকদ্দমায় মিথ্যে জড়িয়ে ফেলে[৪]
গোষ্ঠকে তো চালান দিল সাত বছরের জেলে।

ছেলের এই অপমানে রাই ডোমনি পাড়া ছেড়ে দামোদরের পারে ভিন গাঁয়ে নতুন বাড়ি করল। গ্রামবাসীর খোঁটা সত্ত্বেও রাই ডোমনিকে "মাস-কাবারের জিনিস নিয়ে দেখে আসত" অচলা।

অচলার মতো ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের পরিচিতজনের মধ্যে সে-সময়ের কেউ ছিল কী না, সে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না। তবে এতে বিধৃত জমিদারি-অত্যাচারের চিত্রটি যে বাস্তবতার প্রতিফলন, তাতে সন্দেহ নাই। এ-প্রসঙ্গে নেপাল মজুমদারের অবলোকন :

> তখনও ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধন হয় নাই। জমিদারের খারিজ ফি, সেলামি নজরানা ও নানা অন্যায় আবওয়াব তো ছিলই, তা ছাড়া জমিদার বাড়িতে হামেশাই গরিবদের বেগার খাটিতে হইত। এই বেগার দিতে অস্বীকার করিলে জমিদাররা যে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ-পরায়ণ হইয়া উঠিতে পারে এই কবিতাটিতে কবি তাহার কিছুটা আভাস দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে জমিদার হওয়ার জন্য এবং জমিদারী কাজে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা থাকার দরুণ জমিদারের অত্যাচারের স্বরূপটি খুব ভালোভাবেই জানিতেন। কবি তাহার সমগোত্রীয়দের বা শ্রেণীকে এতটুকু ক্ষমা করেন নাই। এই কবিতাতেও আর একবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল। [নেপাল মজুমদার ১৯৯১ : ১৫৪-৫৫][৫]

ঘটনার তৃতীয় অংশে রোগীর সেবা করতে গিয়েই অচলার মৃত্যু হয়। স্বরূপগঞ্জে অচলার এক পাতানো নাতনি তার শ্বশুরবাড়িতে একজ্বরি রোগে ভুগছিল। অচলা দিনরাত্রি সেবা করে নাতনিকে সুস্থ করে তুলল; কিন্তু নিজে অসুখে পড়ল এবং তাতেই অচলার মৃত্যু হলো। মৃত্যুর পর জানা গেল বুড়ি তার জমানো টাকা দিয়ে গেছে ডোমনিকে আর জিনিসপত্র পাগলা ঝিকে। অচলার জমানো টাকার ওপর লোভ ছিল ব্রাহ্মণ ঠাকুরের। রবীন্দ্রনাথ রচনাটির শেষ চরণে ব্রাহ্মণের মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন : "পরলোকের হারালো পথ, ইহলোকের মান"। এভাবে ব্রাহ্মণ-ঠাকুরদের অর্থ-লোলুপতাকেও কবি হেয় করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন যে পল্লিই বাংলার প্রাণশক্তি। এই বোধ থেকেই কৃষি ও কৃষকের প্রতি গভীর মমতা ছিল কবির। মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে রচিত 'ঐকতান' কবিতায় "কৃষাণের জীবনের শরিক ... মাটির কাছাকাছি" যে-কবি তার বাণী শোনার আগ্রহ ঘোষণা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং নিজের সারা জীবনে পল্লি ও কৃষিপ্রীতিতে "কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা ... অর্জন" করতে পেরেছিলেন। ১৯০৬ সালে এন্ট্রান্স-পাশ কিশোরপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র এবং পরে জামাতা নগেন্দ্রনাথকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছিলেন কৃষি ও গো-পালনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য। শিলাইদহ ও শ্রীনিকেতনে কবির গ্রাম-উন্নয়ন প্রচেষ্টার উপায় ছিল "বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকাজের প্রবর্তন ও গোধনের উন্নতি সাধন"। শান্তিনিকেতনেও ছিল সন্তোষচন্দ্রের গোশালা। ১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সাড়ম্বরে পালন করেছিলেন হলকর্ষণ উৎসব এবং কবি নিজে

তাতে হালচালনা করেছিলেন [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৯৫ : ১৪২]। কবির পল্লি, কৃষি ও গো-প্রীতির[৬] একটি প্রকাশ দেখা যায় *ছড়ার ছবি*-র 'সুধিয়া' (শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩৪৪)-র মধ্যে।

'সুধিয়া'র শুরু শিউনন্দন গয়লার গোয়ালবাড়ির বর্ণনা দিয়ে। "বিশ-পঞ্চাশ চালা" গোশালা, "নদীর ওপার চরে" গোচরণের জন্য ঘাস ও কলাই ক্ষেত, একদল রাখাল ছেলে — সব মিলে শিউনন্দনের এ-স্থাপনা যেন "একটা গোটা গ্রাম"। তাতে মহা ধুমধামে পালিত হতো গোপাষ্টমীর উৎসব। কিন্তু প্রকৃতি বিমুখ হলো! ৩ বছরের অনাবৃষ্টির পর মন্বন্তর এল। তারপর শোণনদীতে শ্রাবণে ভয়াবহ বন্যা —

> ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে গর্জি ছুটল ধারা, ...
> ভেসে চলল গোরু, বাছুর, টান লাগল গাছে।
> মানুষে আর সাপে মিলে শাখা আঁকড়ে আছে।

একসময় বৃষ্টি থামল, নেমে গেল বন্যা —

> শিউনন্দন দাঁড়ালো তার শূন্য ভিটেয় এসে —
> তিনটে শিশুর ঠিকানা নেই, স্ত্রী গেছে তার ভেসে।

এ-চিত্র বন্যাবিধ্বস্ত বাংলার অতি পরিচিত দৃশ্য।

শিউনন্দনের এই অসহায় অবস্থায় "ভীষণ জোয়ান" ছেলে সামরু "এক-গলা ... জলে-ডোবা ... পাড়াটা" থেকে ৩টি গরু নিয়ে ফিরল। দেখল, তার বাবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ইষ্টদেবকে স্মরণ করছে। কিন্তু সামরু অদৃষ্টের এই পরিহাসের বিপরীতে আত্মনির্ভর হতে চায় —

> 'দেব্‌তাকে তোর কেন মরিস ডাকি?
> তার দয়াটা বাঁচিয়ে যেটুকু আজও রইল বাকি
> ভার নেব তার নিজের 'পরেই, ...

অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতাকে হাসিমুখে মেনে নিয়ে তাকে পরিহাস করাটাই রবীন্দ্রনাথের সাধারণ প্রবণতা। কিন্তু সামরুর উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কবি অদৃষ্টের চক্র থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছা জানালেন। 'দেবতার গ্রাস' (কার্তিক ১৩০৪)-এর মতো অসহায় সমর্পণের মধ্যে ঘটনার ইতি টানলো না।

৮টি গরু নিয়ে "ব্যাবসাটা ফের শুরু করল নেহাত গরিব চালে"। কিন্তু "দেনার অজগরে/একে একে গ্রাস করছে", ঘরের সব সম্বল। একদিন পাওনাদার শেঠ দুনিয়াচাঁদ এল সম্পদ পরিদর্শনে, তার ১০ বছরের ছেলের পছন্দ হয়ে গেল সুধিয়া নামের গাইটিকে। কিন্তু সামরুর কাছে সুধিয়া সাত রাজার ধন, তাকে দিয়ে দেওয়া যাবে না। শেঠজি মাথা নেড়ে জানাল, "দুই-চারি মাস যেতেই/ওই সুধিয়ার গতি হবে আমার গোয়ালেতেই"।[৮] সামরুর সুধিয়া-প্রীতি আরও বাড়ে; এই আকালে নিজে আধপেট খেয়ে খাওয়ায় গরুকে, তার কানে কানে কথা বলে। এর মধ্যে সামরু এক সপ্তাহের জন্য নবাববাড়ি যায় কুস্তি

করতে। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ শৈশবে এক অন্ধ পান্‌জাবি পালোয়ানের কাছে কুস্তির যে তালিম নিতেন, তার রেশ থাকতে পারে এখানে। কুস্তি থেকে ফিরে এসে দেখে, দুনিয়াচাঁদ ডিক্রি জারি করে সুধিয়াকে নিয়ে গেছে।

সামরু ভোজালি হাতে ছুটে যায় নাজির-মহল্লায়। সামরুকে ফেরত চাইলে শেঠ দুনিয়াচাঁদ তাকে পরিহাস করে। প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রসাহিত্যে একজন শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদী বজ্রকণ্ঠ শোনা যায় —

> 'সুধিয়া রে' 'সুধিয়া রে' সামরু দিল হাঁক,
> পাড়ার আকাশ পেরিয়ে গেল বজ্রমন্দ্র ডাক।

দড়ি ছিঁড়ে ছুটে এল সুধিয়া, দেখা গেল কদিন খাবার খায় নি। দুনিয়াচাঁদ সামরুকে ভয় দেখাল, "গোল কর তো ডাকব পুলিস"। সামরুর উত্তর —

> ফাঁসি আমি ভয় করি নে এইটে মনে রেখো।
> দশ বছরের জেল খাটব, ফিরব তো তার পর—
> সেই কথাটাই ভেবো বসে, আমি চললেম ঘর।

ডিক্রি জারি করে নিঃস্ব কৃষকের শেষ সম্বলটুকু হরণ করা — মহাজনের শোষণের এই চিত্র নতুন নয়। উপেনের 'দুই বিঘা জমি' (৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২) ভূস্বামীর বাগানের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান করার জন্য দরকার। উপেন তাতে রাজি না হলে মিথ্যা দেনার খতে ডিক্রি জারি করে ভূস্বামী তা দখল করেছে। উপেন সাতপুরুষের ভিটা রক্ষায় করুণা চেয়েছে; প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করতে পারেনি। পরিণতিতে ভিটে মাটি ছেড়ে বিশ্বনিখিলের পথে বাসভূমি ত্যাগ করেছে। 'সামান্য ক্ষতি'র মালতী গরিবের কুটির পুড়িয়ে রানীর করপদতল তপ্ত করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, কিন্তু প্রতিকার করতে পারেনি। সেখানে ভোজালি হাতে মহাজনের গদিতে গিয়ে ডিক্রি করা সম্পদ ফিরিয়ে নিয়ে আসা — এমন প্রতিবাদী চরিত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিরল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী শেষজীবনে অত্যাচারিতের সবল প্রতিরোধের পক্ষপাতী হয়ে উঠছিলেন?

'সুধিয়া'র ঘটনাংশে মানুষ ও পশুর প্রীতিময় সম্পর্কের দিকটিও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এ-প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্পের তুলনা টানা যায়। সামরুর মতো চরিত্রের অভ্যুদয়ের পর নেপাল মজুমদার আশা করেন : "শরৎচন্দ্রের গফুরের মত ক্ষুধাশীর্ণ, পিঙ্গল দুটি চক্ষু আকাশের পানে তুলিয়া আর তাহারা অশ্রু বিসর্জন করিবে না [নেপাল মজুমদার ১৯৯১ : ১৫৭]।

'মাধো' (শ্রাবণ ১৩৪৪)-তে অঙ্কিত হয়েছে সাম্য ও ঔপনিবেশিক শোষণের চিত্রের অপরপিঠ। উনিশ-বিশ শতকে অবস্থাপন্ন ভারতীয়দের দলে টানতে ইংরেজরা যে-সকল উপাধি প্রদান করত, রায়বাহাদুর-খানবাহাদুর তার অন্যতম। 'মাধো'র ঘটনাংশের পটভূমি কিষণলাল নামের সে-রকম একজন রায়বাহাদুরের স্যাকরা জগন্নাথকে নিয়ে। সোনারূপোর নিপুণ কারিগর জগন্নাথ তার ছোট ছেলে মাধোকে আপনবিদ্যা শেখাতে তৎপর। কিন্তু মাধোর উৎসাহ ভিন্ন — শহরতলির বাইরে পুরোনো দিঘির ধারে গুলিডাণ্ডা খেলা, দোলনায়

চড়া, ফলের বাগানে ঘুরে বেড়ানো, শিশুডালের ছড়ি দিয়ে ছিপ বানানো, ছাতুর গুলি ছড়িয়ে শালিখ পাখি ধরা — এই নিয়ে মাধোর রঙিন শৈশব। বটু নামের কুকুর তার সঙ্গী।

কিষণলালের ছেলে দুলাল, পাড়াশুদ্ধ লোক তার অত্যাচারের ভয়ে থাকে। কুকুর বটুর সাঁতার কাটতে যাবার পথে দুলাল চাবুক নিয়ে তেড়ে এল। মাধো তার "চাবুক কেড়ে নিয়ে ... করলে দু-তিন-খানা"। প্রভু-অনুগত জগন্নাথ দশ-বিশ-জন লোক লাগিয়ে ছেলেকে ধরে এনে খাটের খুরোয় কষে বেঁধে জানিয়ে দিল —

'জানিস নেকো, বেটা, কাহার অন্ন ধরিস!
এত বড়ো বুকের পাটা, মনিবকে তুই মারিস!
আজ বিকালে হাটের মধ্যে হিঁচড়ে নিয়ে তোকে
দুলাল স্বয়ং মারবে চাবুক, দেখবে সকল লোকে।'

কিন্তু দিনশেষে মনিববাড়ির পেয়াদা যখন মাধোকে ধরে নিতে আসল, দেখে "দড়ি আছে পড়ি, মাধো নিরুদ্দেশ"। মাধোর মা জানাল, তিনি "আপন হাতে বাঁধন" খুলে দিয়েছেন; কেননা পুত্রের "এমন অপমানের চেয়ে মরণ ভালো"। এরপর "স্বামীর 'পরে ... দারুণ অবজ্ঞার" দৃষ্টি হেনে —

বললে, 'তোমার গোলামিতে ধিক্ সহস্রবার।'

এই বিদ্রোহও সে-সময়ের সমাজে অবিশ্বাস্য; রবীন্দ্র-সাহিত্যের ধারায়ও বিরল তো বটেই!

ঘটনার দ্বিতীয়াংশের উন্মোচন বিশ-পঁচিশ বছর পরে। মাধো বাংলাদেশে (পূর্ব বাংলায়?) গিয়ে পাটকলে মজুরদের সর্দারের চাকুরি করে। স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে মাধো তখন সংসারী। কিন্তু এমন সময় পাটের বাজারে দরপতন হলো; মজুরদের মাইনে কমিয়ে দিতেই শুরু হলো ধর্মঘট। পাটকলের সাহেব মাধোর সঙ্গে গোপন আঁতাত করতে চাইল। কিন্তু মাধো জানিয়ে দিল, "মরাই ভালো এ বেইমানির চেয়ে"। ধর্মঘট দমাতে পুলিস নামল; কেউ আহত হলো, কেউ গ্রেফতার। মাধো চাকুরিতে ইস্তফা দিল।

ঘটনার এই অংশের পটভূমি ১৯৩৭-এর পাটকল ধর্মঘট। বিশ শতকের তিরিশের দশকের বিশ্বমন্দা ও আসন্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যকালীন সময়ে পাটের বাজারে যে দরপতন হয় তাতে পাটকল-মালিকরা নামমাত্র মূল্যে বিপুল পরিমাণ পাট ক্রয় করলেও শ্রমিক ছাঁটাই ও মজুরি হ্রাসের নীতি গ্রহণ করে। অনেক চটকলে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মজুরি হ্রাস করা হয় এবং ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারি নাগাদ এর প্রতিবাদে ধর্মঘটীদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় সোয়া ২ লক্ষে; অনেক স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করে লাঠিচার্জ করা হয় [অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০২ : ৩৫০]। নেপাল মজুমদার মনে করেন :

> মজুরদের ন্যায়সঙ্গত ধর্মঘটের উপরেও তাঁহার [কবির] সুস্পষ্ট সমর্থন দেখা গেল; আর ধর্মঘটভঙ্গকারী বেইমানির (বা ব্ল্যাক-লেগিজিমের) প্রতি জানাইলেন দারুণ ঘৃণা। ... কলিকাতার সেই ঐতিহাসিক পাটকল শ্রমিক ধর্মঘটের অভিঘাতে কবির মনে যে ক্ষুব্ধ আলোড়নের ঢেউ তুলিয়াছিল তাহাই 'ছড়ার ছবি'র কবিতাগুচ্ছে প্রকাশ পাইল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। [নেপাল মজুমদার ১৯৯১ : ১৫৪]

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চটকলের ইউরোপীয় মালিকদের শোষণের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন [অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০২ : ৩৫০]। এবারও আলমোড়া যাত্রার প্রাক্কালে ২৯ এপ্রিল, ১৯৩৭-এ সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন :

> It has deeply grieved me to learn of the suffering of hundreds of thousands of jute workers who have struck work since February last. This is causing misery not only to the workers themselves but also to their women and children. The demands for higher wages and for more humane conditions of work are just reasonable. ... Humanity demands that those who bear the burden of the society should be protected and looked after by the society itself.

'মাধো'তে বাংলার শিল্পায়ন, কৃষিজীবী মানুষের শিল্প-শ্রমিকে রূপান্তর এবং শ্রমিকদের শোষণমুক্তির চেতনার প্রকাশ প্রত্যক্ষ। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সামন্তযুগের শেকল বা দড়ি ছেঁড়ার প্রবণতা —

> মনিববাড়ির পেয়াদা এল দিন হল যেই শেষ —
> দেখলে দড়ি আছে পড়ি, মাধো নিরুদ্দেশ।

পাটকল ছাড়ার পরে রবীন্দ্রনাথ মাধোকে "যে দেশ থেকে দেশ গেছে তার মুছে", সেই দেশের উদ্দেশ্যে বুকে ভরসা নিয়ে পথে বের করে দেন; তখন কী কবি বলতে চান পল্লি আর কৃষিই বাংলার মানুষের শেষ ঠিকানা? কিন্তু কবিও তো স্বীকার করেন "বাঁধন গেছে ঘুচে" এবং তাঁর সন্দেহ, "ছেঁড়া শিকড় পাবে কি আর পুরোনো তার মাটি"?

'ভ্রমণী', 'খাটুলি', 'পিস্‌নি', 'বুধু', 'দেশান্তরী', 'অচলা বুড়ি', 'সুধিয়া', 'মাধো', কবিতাগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদল শ্রমজীবী বঞ্চিত মানুষের জীবনকে মহিমান্বিত করেছেন। তাদের বিপরীতে রয়েছে কয়েকজন ভূস্বামী, সামন্ত আর পুঁজিপতির অন্যায়-অত্যাচার-শোষণ। নেপাল মজুমদার *ছড়ার ছবি*-র মূল চরিত্রগুলোকে মনে করেন "নাম-না-জানা গরিব পাড়ার লোক", যারা "খালি গায়ে ... সারাটা বছর রোদ-জল-ঝড়-বজ্র-বিদ্যুৎ মাথায় করিয়া মাঠে চাষ করে" এবং "তাহারাই না-খাইতে পাইয়া বাকি খাজনা আর মহাজনের দেনার দায়ে সর্বস্ব খুইয়ে শহরের রাস্তায় বাহির হইয়াছে কাজের খোঁজে [নেপাল মজুমদার ১৯৯১ : ১৪৯]। এ-প্রসঙ্গে মজুমদারের মূল্যায়ন :

> কোথাও কোনো কষ্ট-কল্পনা নাই. — একটি স্বাভাবিক গতি-প্রবাহ আছে সবগুলিতেই। যাঁহারা সাহিত্যে শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজচেতনার কথা বলেন তাঁহারা লক্ষ্য করিবেন, রবীন্দ্রনাথ জমিদার-মহাজনদের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কী সুতীব্র ঘৃণা ও উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন এর প্রতিটি ছড়ায়-কাব্যে। তাঁহারা এও দেখিতে পাইবেন, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে চাষীর স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ও সংগ্রাম-প্রবণতাকে কবি কতখানি মহিমান্বিতরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

শিলাইদহে কবির একজন সঙ্গী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী মনে করেন এর অনেক চরিত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত :

সেই দীর্ঘ নিভৃত অজ্ঞাতবাসে বসে তাঁর হৃদয়ের গোপন মর্মবাণীটি শুন্‌বার সময়ে যাঁরা তাঁর সঙ্গী ছিলেন... তাঁরা ছিলেন নিরক্ষর সহজ সরল অতিসাধারণ গ্রাম্য নরনারী। ... এদের নিভৃত সাহচর্য নব নব সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলার সমগ্র সৃষ্টি ও মানবতার সাধনায় রবীন্দ্রনাথের অবদানের মধ্যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা না জানলে রবীন্দ্রপ্রতিভার পূর্ণ দর্শনলাভ হতে পারে না। [শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ১৩৬৬ : ২৯-৩০]

৪.

শহরের উপাদান ও অনুষঙ্গ আছে *ছড়ার ছবি*-তে এরকম রচনা মাত্র একটি – 'বাসাবাড়ি' (আলমোড়া, ৯.০৬.১৯৩৭)। রচনাটি হয় দার্শনিকতায়, নয়তো হেঁয়ালিতে পূর্ণ; পাঠ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "ধাঁধা ক্রমেই বেড়ে ওঠে"।

রচনাটির ঘটনাংশ স্বল্প। কোনো এক নতুন শহরে আগন্তুক রাত আড়াইটায় হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানার বাসা খুঁজছেন। পথের বাঁ দিকে ঘাট, তার সামনে চৌতালা বাড়ি। চৌতালার একটি জানলায় প্রদীপ জ্বলছে; বাকি সমস্ত বাড়ি অন্ধকার। আগন্তুক শুধান, "আছ কি কেউ, জায়গা কোথায় পাই?" মনে হলো উত্তর এল, "আমরা নাই নাই"। কিন্তু রাত ভোর হয়ে দিনের কোলাহল পট বদলে দিল। সকাল বেলায় দেখা গেল সেই বাড়িতেই ছেলেরা কাঠি হাতে লড়াই লড়াই খেলছে। কোণের ঘরে দুই বুড়ো বকাবকি করছে। রান্নাঘর থেকে গন্ধ ভেসে আসছে। বাসন মাজার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, "শূন্য ঝুড়ি দুলিয়ে ... ঝি চলেছে বাজার" করতে। এই দৃশ্য নগর-দালানের অতি পরিচিত দৃশ্য।

কিন্তু রচনাটির ভাবজগৎ গভীর হয়ে ওঠে যখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বাসাবাড়িকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করছেন :

বিদেশীর এই বাসাবাড়ি – কেউ বা কয়েক মাস
এইখানে সংসার পেতেছে, করছে বসবাস;
কাজকর্ম সাঙ্গ করি কেউবা কয়েক দিনে
চুকিয়ে ভাড়া কোন্‌খানে যায়, কেই বা তাদের চিনে।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু মনে করেন যে, বাসাবাড়ির সঙ্গে মানুষের নাড়ির সম্পর্ক গড়ে ওঠে না এবং এই পৃথিবী বাসাবাড়ির মতোই [শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৩৭৩ : ১৬১]। অনুত্তম ভট্টাচার্য মনে করেন এর অর্থ গভীরতর – 'বাসাবাড়ি'র রূপকাশ্রয়ে এতে অস্তিত্ব অনস্তিত্বের তত্ত্বকথা উপস্থাপিত।

'বাসাবাড়ি'র প্রতিপাদ্য শহরের অনুষঙ্গে নির্মিত হলেও নগরবিমুখতা এতে প্রত্যক্ষ। বাসা খুঁজতে গিয়ে কবির মনে হয়েছে শহরে "অজগরের ভূতের মতন গলির পরে গলি"। সামনে খাড়া বাড়িগুলো তাঁর কাছে "আঁধার-মুখোশ-পরা"; মহলগুলো "কালো মোটা ঘোমটা-দেওয়া দৈত্যনারীর মতো"। এমনকি রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় প্রদীপশিখাও যেন "ছুচোঁর মতো বিঁধছে আঁধারটাকে" — নগর বিমুখতার নেতিবাচকতা কবিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

'ভ্রমণী'তেও কবি অনুভব করেছেন যে, তিনি "মাটির ছেলে হয়ে জন্ম" নিয়েছেন; কিন্তু "শহর ... পোষ্যপুত্র করে" ফেলেছে এবং তাঁর "চতুর্দিকে ... ইঁট-পাথরের আলিঙ্গনের ... আড়াল"। নগর সম্পর্কে তাঁর সুপরিচিত উক্তি "ইঁটের পরে ইঁট/মাঝে মানুষ কীট" এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। *চিত্রবিচিত্র* গ্রন্থে "একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু" (৬ পৌষ ১৩৩৬) কবিতার যে পাঠান্তর পাওয়া যায় তাও এর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ :

ইঁটের-টোপর-মাথায়-পরা শহর কলিকাতা
অটল হয়ে বসে আছে, ইঁটের আসন-পাতা। ...
... কলকাতাটা চলে বেড়ায় ইঁটের শরীর নেড়ে।
উঁচু ছাদে নিচু ছাদে পাঁচিল-দেওয়া ছাদে
আকাশ যেন সওয়ার হয়ে চড়েছে তার কাঁধে।
রাস্তা গলি যাচ্ছে চলি অজগরের দল, ...

'যোগীন দা'-র গল্পের আসরের বর্ণনাতেও নতুন নতুন নাগরিক সুবিধা গ্রহণ করতে গিয়ে পুরোনো পরিবেশের পরিবর্তনে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন —

সেই সেকালের সন্ধ্যা মোদের সন্ধ্যা ছিল সত্যি,
দিন-ভ্যাঙানো ইলেক্‌ট্রিকের হয় নিকো উৎপত্তি।

অথচ কবি তো এর অন্তত এক যুগ আগে বিশ্বভারতীর ছাত্রাবাসে কুষ্টিয়া থেকে ডায়ানামো আনিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন! [অনাথনাথ দাস ১৯৯৩ : ৪১]

অবশ্য স্মৃতিকথার বিবরণ শহরের আলোকব্যবস্থার পরিবর্তনের চিহ্নবাহী :

ক. তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি; ... সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ১৩ : ৭১১]

খ. আমরা যখন ছোটে ছিলুম তখন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না। এখনকার কালে সূর্যের আলোর দিনটা যেমনি ফুরিয়েছে অমনি শুরু হয়েছে বিজলি আলোর দিন। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ১৩ : ৭১৬]

'পাথরপিণ্ড' (আলমোড়া, ১৩৪৪) সমুদ্রতীরে প্রায় জলের উপর জেগে থাকা পাথরগুচ্ছকে নিয়ে লেখা যাতে মূলত পৃথিবীতে শিলাখণ্ডের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ইতিহাস বিধৃত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেবারে আলমোড়ায় বাসকালে *ছড়ার ছবি*-র সমান্তরালে শান্তিনিকেতনের বিজ্ঞান-অধ্যাপক প্রথমনাথ সেনগুপ্তের শুরু করা বিশ্বজগতের উৎপত্তি সংক্রান্ত গ্রন্থটি পুনর্লিখন করছিলেন। পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগত, গ্রহলোক, ভূলোক — এর সৃষ্টি ও বিকাশ নিয়ে এই গ্রন্থ সমাপ্ত। কবি যে এর আগে থেকেই পাথর বা শিলাখণ্ডের উৎপত্তি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় রবীন্দ্রভবনের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে। কানাই সামন্ত উল্লেখ করেছেন যে, রবীন্দ্রসদন সংগ্রহের পাণ্ডুলিপিতে 'পাথরপিণ্ড'-এর দুটি ভিন্ন পাঠ পাওয়া গেছে; নকলের তারিখ শান্তিনিকেতন, ৬ বৈশাখ ১৩৪৪। এর ছন্দ ও ভাষা ভিন্ন; যেমন "লক্ষ কোটি বর্ষ গেছে চলে/ধরনীর বক্ষ ভেদি উঠেছিল জ্বলে" [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৬ : ১১৪]। তবে *ছড়ার ছবি*-তে ব্যবহৃত পাঠটি পরে আলমোড়ায় লেখা।

'পাথরপিণ্ড'-এর দুটো স্তবক। প্রথম স্তবকে এবং নন্দলাল বসুর স্কেচে সমুদ্রতীরে একগুচ্ছ পাথর দাঁড়িয়ে আছে "কোটি বছর থেকে"। "পণ্ডিতেরা তার ইতিহাস ... খুঁজি" "বের করেছেন"; দ্বিতীয় স্তবকটি তার বিবরণ। বিবরণে পাওয়া যায়, যুগ যুগ আগে জ্বলন্ত বাষ্প উদ্‌গীরণ হয়েছিল জ্যোতিষ্কমণ্ডলে; কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে তা পৃথিবীতে নেমে আসে এবং শীতল হয়ে একসময় পাথরে পরিণত হয়। *বিশ্বপরিচয়* গ্রন্থেও কবি বারবার বলেছেন যে, "... বিশ্বের হালকা সব জিনিসই ছিল গ্যাস" এবং "কোটি কোটি বছর ধরে ... তাপ কমতে কমতে ... ছোটো ছোটো টুকরো ঘন হয়ে [নক্ষত্রলোক থেকে] ভেঙ্গে পড়েছে" [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ১১৩ : ৫৩৭]।

রচনাটি পাঠে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এই পাথরপিণ্ডকে প্রাণহীন মনে করেন নি। কবির অনুভবে পাথরপিণ্ড অন্ধ নয়ন নিয়ে কাতর, যন্ত্রণায় নির্বাক। ২২ বছর বয়সে সমুদ্রদর্শনের পর পুরীর ভুবনেশ্বর মন্দিরের পাথর দেখে কবি লিখেছিলেন: "বেশ বুঝিলাম, এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে" [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৯৫ : ৪২]।

'আকাশপ্রদীপ' (পতিসর, ৮[?] শ্রাবণ, ১৩৪৪) *ছড়ার ছবি*-তে সংকলিত রচনাগুলোর মধ্যে সবশেষে লেখা। শুদ্ধসত্ত্ব বসু যথার্থই লক্ষ করেছেন যে, রচনাটি ভাবের দিক থেকে এই গ্রন্থের অন্য কবিতাগুলোর সঙ্গে খাপ খায় না [শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৩৭৩ : ২৪১]। মা-হারা দুটি ভাইবোন; বোনটি অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে যাতে সেই আলোর পথ ধরে স্বর্গ থেকে মা এসে রাতে বিছানায় শোয়া ভাইবোনকে চুমু খেয়ে যেতে পারে। এই সংক্ষিপ্ত ঘটনা সংবলিত রচনার নাম কেন 'আকাশপ্রদীপ' তার ব্যাখ্যা নেই। তবে এর ৩ বছর পরে কবি যখন তাঁর একটি কাব্যের নামকরণ করেন *আকাশ প্রদীপ* (বৈশাখ ১৩৪৬) তখন মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন যে "সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানো যখন শেষ হয়ে গেল, তখন মহাশূন্যে মহাকাশে জাগিয়ে তোলো অন্য জ্যোতি — ঘরের থেকে বাইরে যাওয়া [অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০৩ : ২]। *আকাশ প্রদীপ* কাব্যে সংকলিত 'যাত্রাপথ' কবিতাটি আলমোড়ায় লেখা (২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪)। কবি *প্রান্তিক* (পৌষ ১৩৪৪) ও *সেঁজুতি* (ভাদ্র ১৩৪৫)-তে সেটি সংকলিত করেন নি। মনে হয় আকাশ প্রদীপের ধারণাটি কবি আলমোড়াতেই পেয়েছিলেন।

মা-হারা ভাইবোনের কল্পনার মধ্যে কী কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোনো ছায়া আছে? কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর (১৯০২) আগের বছর বিয়ে হয়ে যায় কন্যা মাধুরীলতা ও রেণুকার; রথীন্দ্রনাথ তখন ১৪ বছরের কিশোর। ভাইবোনের মধ্যে কী কবি মাতৃহারা ১০ বছরের কন্যা মীরা এবং ৮ বছরের পুত্র শমীন্দ্রের ছবি দেখছিলেন?

ছড়ার ছবি-র 'আকাশপ্রদীপ'-এ মা আকাশে "তারায় তারায় পথ হারিয়ে" ফেলছেন। কিন্তু *আকাশপ্রদীপ* কাব্যের প্রবেশক কবিতা 'আকাশপ্রদীপ'-এ আকাশের তারাটিই শুধু অতীতের সাক্ষী যখন "ঘরের মাঝে সাঙ্গ হল/চেনামুখের মেলা"। *আকাশ প্রদীপ* "স্মৃতিপটে অতীতাভিসার" [অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০৩ : ৭]। *ছড়ার ছবি*-র 'আকাশ প্রদীপ'ও অতীতের স্মৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, এমন মনে করা অযৌক্তিক নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলমোড়া যাবার সময় "রাশীকৃত বিজ্ঞানের বই"য়ের সঙ্গে নিয়েছিলেন "নন্দলালের আঁকা বহু কার্ডস্কেচ" [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৯৫ : ১৭৩]। 'ছবি-আঁকিয়ে' রচনাটি সন্দেহাতীতভাবেই নন্দলালের প্রতি ঋণস্বীকার। নন্দলালের আঁকা মোট ৩৮টি ছবি ব্যবহার করা হয়েছে *ছড়ার ছবি*-র অঙ্গসজ্জায়। এর অধিকাংশ ছবি তুলির রেখায় নয়, কলমে আঁকা। অধিকাংশ ছবিতেই তারিখ নেই; যে ছয়টি ছবিতে তারিখ পড়া যায় তার একটি ১৯১৯ (বালক), দুটি ১৯২৯ (খেলা, অচলাবুড়ী), দুটি ১৯৩০ (জলযাত্রা, রিক্ত) এবং একটি ১৯৩৫ (বুধু) সালে অঙ্কিত। ধরে নেয়া যায় যে, ছবিগুলো নন্দলাল নানা সময়ে "দেশ-বিদেশের থেকে" কবিকে পাঠিয়েছিলেন।

নন্দলাল বসু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচর্যায় ঠাকুরবাড়িতে শিল্পচর্চা করেছেন বিশ শতকের শুরুর দশকেই। ১৯২০ সাল থেকে স্থায়ীভাবে বাস করেছেন শান্তিনিকেতনে; সে হিসেবে কবির জীবনের শেষ দু'দশকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'ছবি-আঁকিয়ে' রচনায় স্পষ্ট করেই বলেছেন যে নন্দনালের "চোখে ভেদ ঘটে নাই চণ্ডালে আর দ্বিজে"। গরিবপাড়ার "ঘেঁষাঘেঁষি কয়টা কুটীর", তার দিকে চক্ষু মেলে কেই বা তাকায়? কিন্তু শিল্পীর তুলিতে এর চিহ্নিত রূপ "দেখার মতোই জিনিস বটে"! পথচলা মানুষ, যাদের "পৌঁছে না কেউ নাম" ; শিল্পীর চিত্রে তারাই সত্যি মানুষ হয়ে ওঠে। কবির ভাষায় রাজা-বাদশা-নবাবের খরচ করে আঁকানো ছবি "সাজে-সজ্জায় বোকার লাগায় ধাঁধা"; কিন্তু শিল্পরসিক তার দিকে তাকায় না।

নন্দনাল বসু সম্পর্কে গান্ধীর মূল্যায়ন এখানে প্রাসঙ্গিক হবে :

> He (Nandalal) launched out to the villages with the eye of an artist that is his and picked up numerous things from the peasants' household, things that never catch an ordinary eye as striking object of art, but which his discerning eye picked up and arranged and thus clothed with a new meaning (Syed Mohammad Shahed 2012 : 141).

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, নন্দলালের চিত্রে সামান্য একটা ছাগলের ছবিও মুহূর্তে চমক লাগিয়ে দিতে পারে।

চ.

ছড়ার ছবি-র কিছু কিছু রচনায় গভীরতর ব্যঞ্জনা আছে; রবীন্দ্র-দর্শনের প্রকাশ আছে এমন বলাও অসংগত হবে না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তা ও মর্ত্যপ্রীতির প্রকাশ রয়েছে 'পিছু ডাকা'-য় (আলমোড়া, ২০ জুন ১৯৩৭)। এ-রচনায় কবি 'দিনের শেষে' ঘুমের দেশের বদলে "সমুখ পানে সূর্য-ডোবার দেশে"র দিকে যখন চেয়ে দেখেন তখন অতীত স্মৃতি ভেসে ওঠে। কিন্তু নানা কীর্তি, মূর্তি, দেবালয় বা শক্তিমানের হারিয়ে যাওয়াতে কবির মনে ব্যথা লাগে না। কিন্তু যখন মনে হয় যে সবুজ বনে চরা গরু কিংবা "ঘাসের আঁঠি মাথায়" হাটমুখী মেয়ে কিংবা "শুকনো বাঁশের পাতায়" ঢাকা সরু পথ — এসবই থেকে যাবে, কিন্তু তাতে কবির ঠাঁই রবে না; তখন কবির মনে বেদনা বাজে এবং "মর্ত্যধরার পিছু-ডাকা দোলা লাগায় বুকে"। ৭৫-উর্ধ্ব কবির ২০ বছর বয়সের উচ্চারণ "মরণ রে,/তুঁ হুঁ মম শ্যামসমান"-এর রোম্যান্টিকতা ঢাকা পড়ে যায় যেন।

অথচ দু'দশক আগেও রবীন্দ্রনাথ 'চির আমি' (চৈত্র ১৩২২)-তে এ বিচ্ছেদ অতিক্রমের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন :

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
... কাটবে গো দিন যেমন আজও দিন কাটে।
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী এমনি সেদিন উঠবে ভরি
চরবে গোরু, খেলবে রাখাল ওই মাঠে। ...
... তখন কে বলে গো, সেই প্রভাতে নেই আমি?
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।

'পিছু-ডাকা' প্রসঙ্গে সুকুমার সেনও তাই স্বীকার করেন যে, "অস্তাচলগামী রবির অনুরাগ ধরণীর তুচ্ছতাকে দুর্লভতায় রঙিনতর করিয়াছে" [সুকুমার সেন ১৯৯৬ : ১৬০]।

'পিছু-ডাকা'র রবীন্দ্র-অনুভবে স্পষ্ট যে শাসক বা ধর্মগুরুর শক্তি-কীর্তি চিরস্থায়ী হবে না; যেমনটি বলেছিলেন 'শা-জাহান' (কার্তিক ১৩২১)-এ – "কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান"। রবীন্দ্রনাথ নিজেও চাষি, তাঁতি, জেলের "প্রাঙ্গণের ধারে" গিয়ে "কৃষাণের জীবনের শরিক" হতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন যে, এই পৃথিবীতে মানুষ শুধুই পান্থজন। তাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক ক্ষণকালের ভাড়াবাসার মতো। 'বাসাবাড়ি' নিয়ে শুদ্ধসত্ত্ব বসু প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন — "বাসাবাড়ির সঙ্গে মানুষের নাড়ির সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। ... বাসাবাড়ির মতোই এই পৃথিবী — এখানে চারদিকে না থাকার বেদনাহত সুর" [শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৩৭৯ : ১৫৩]। রচনাটিতেও রয়েছে :

বিদেশীর এই বাসাবাড়ি – কেউবা কয়েক মাস
এখানে সংসার পেতেছে, করছে বসবাস;
কাজকর্ম সাঙ্গ করি কেউ বা কয়েক দিনে
চুকিয়ে ভাড়া কোন্‌খানে যায়, কেই বা তাদের চিনে।

কোনো কোনো সমালোচক এমনও মনে করেন যে, 'বাসাবাড়ি'-তে রূপকের আশ্রয়ে অস্তিত্ব — অনস্তিত্বের তত্ত্বকথা বলা হয়েছে [অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০২ : ৩৫৬]। যে বাসা দিনের আলোয় এত কর্মচঞ্চল, রাতে যেন তা প্রাণহীন। এমনকি 'সোনার তরী'র ভাবের রেশও পাওয়া যায়—

শুধাই আমি, 'আছ কি কেউ, জায়গা কোথায় পাই?'
মনে হল জবাব এল, 'আমরা না ই নাই।'
একসঙ্গে চলার বেগে হাজার পাখা তাই
অন্ধকারে জাগায় ধ্বনি, 'আমরা না ই নাই।'

পান্থজনের কথাটিকে রবীন্দ্রনাথ আরও পরিষ্কার করে বলেছেন 'ভ্রমণী'তে :

পথিক যে জন পথে পথেই পায় সে পৃথিবীকে,
মুক্ত সে চৌদিকে।

'ঘরের খেয়া'র ব্যঞ্জনা কবির প্রিয় বিষয় সীমা-অসীম নিয়ে। আসন্ন সন্ধ্যার মুখে নেয়ে চলেছে গাঁয়ের পানে, চিহ্নবিহীন পথে হাঁসের দল হিমালয়ের পানে, অচিন-শূন্যে-ওড়া

পাখির নীড় অসীম আকাশের সীমানায়। অথচ পথিকের "চলার ঠিকানা নাই"। শুদ্ধসত্ত্ব বসু মনে করেন যে, অনন্তের মধ্যে নিজের স্থান সন্ধানের উপলব্ধিই 'ঘরের খেয়া'র মূল কথা [শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৩৭৩ : ২৩৪]।

পৃথিবীতে অবিরাম জগদীশ্বরের লীলা চলছে, রবীন্দ্রনাথের এই বোধ *ছড়ার ছবি*-তেও মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়েছে। 'পদ্মায়' কবির ফেলে আসা দিনকে মনে হয়েছে —

কী জানি সেই দিনগুলি সব কোন্ আঁকিয়ের লেখা,
ঝিকিমিকি সোনার রঙে হালকা তুলির রেখা।

'খেলা'য় এই লীলাখেলার কথাটা বলতে রবীন্দ্রনাথ আর কোনো আড়াল রাখেন নি —

এই জগতের শক্ত মনিব সয় না একটু ত্রুটি,
যেমন নিত্য কাজের পালা তেমনি নিত্য ছুটি।
বাতাসে তার ছেলেখেলা, আকাশে তার হাসি
সাগর জুড়ে গদ্‌গদ ভাষ বুদুবুদে যায় ভাসি।
ঝরনা ছোটে দূরের ডাকে পাথরগুলো ঠেলে–
কাজের সঙ্গে নাচের খেয়াল কোথায় থেকে পেলে।

এমন কী 'খাটুলি'র সব হারানো বৃদ্ধও —

শুকনো করুণ চক্ষু দুটো তুলে উপর-পানে
কার খেলা এই দুঃখসুখের, কী ভাবলে সেই জানে।

তবে 'সুধিয়া', 'মাধো' প্রভৃতি রচনায় অদৃষ্টের পরিহাসকে জয় করবার প্রত্যয় স্পষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জগদীশ্বরের লীলাকে এসবের চেয়ে পৃথক করেই দেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলিতে বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে প্রকৃতি। তাঁর গান, কবিতা, ছোটগল্প, চিঠিপত্র প্রভৃতিতে প্রকৃতি শুধু মানুষের প্রেরণাদায়িনীই নয়; বরং মানুষের মতনই সজীব ও সচল। "প্রকৃতি তাহার রূপরস গন্ধ লইয়া ... আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে" [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ১৪ : ১৪৩], কবির এই উক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে তাঁর *আত্মপরিচয়*-এ। সেখানে প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের চেতনার অঙ্গ। 'তপোবন' প্রবন্ধে কবি "প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন" এর কথা বলেছেন, অনেকটা উপনিষদের মতো।

ছড়ার ছবি-তেও অধিকাংশ রচনায় প্রকৃতির কথা রয়েছে। নদী, আকাশ, চাঁদের কিরণ, রোদ-মেঘ-বৃষ্টি, পশু-পাখি, বৃক্ষ-বনলতা প্রভৃতির বিবরণ রয়েছে 'আকাশ', 'পদ্মায়', 'ঘরের খেয়া', 'খাটুলি', 'প্রবাসে', 'চড়িভাতি', 'তালগাছ', 'ঝড়', 'অজয় নদী', 'রিক্ত', 'ভজহরি', 'আকাশপ্রদীপ' প্রভৃতি রচনায়। 'খাটুলি'র বৃদ্ধ যখন সব হারিয়ে নিঃস্ব, তখন কবি বৃদ্ধের "জন্মমরণ ব্যেপে ... প্রাণের ধন" হিসেবে দেখেন—

ওর যে আছে খোলা আকাশ, ওর যে মাথার কাছে
শিস দিয়ে যায় বুলবুলিরা আলোছায়ার নাচে, ...
চক্ষু ভোলায় ক্ষেতের ফসল রঙের হরির-লুটে—।

'পিছু-ডাকা'য় মর্ত্যপ্রীতিতে মগ্ন রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পরের বিচ্ছিন্নতা নিয়ে যখন ভাবেন, তখনও দুঃখ হয় প্রকৃতি ও প্রতিদিনের সাধারণের জীবনের মধ্যে তাঁর ঠাঁই হবে না বলে। এমন কি 'চড়িভাতি'তে কবি স্পষ্ট করেই বলেন আদিমসমাজের প্রতি তার প্রীতির কথা—

মানুষ যখন পাকা ক'রে প্রাচীর তোলে নাই,
মাঠে বনে শৈলগুহায় যখন তাহার ঠাঁই,
সেই দিনকার আলগা বিধির বাইরে-ঘোরা প্রাণ
মাঝে মাঝে রক্তে আজও লাগায় মন্ত্রগান।
সেইদিনকার যথেচ্ছ-রস আস্বাদনের খোঁজে
মিলেছিলেম অবেলাতে অনিয়মের ভোজে।

এর বিপরীতে, নগরায়ণে তাঁর অসম্মতিও প্রত্যক্ষ। নগরে "ইঁট-পাথরের আলিঙ্গনের আড়াল" (ভ্রমণী); "অজগরের ভূতের মতন গলি" ('বাসাবাড়ি') কিংবা "দিন-ভ্যাঙানো ইলেক্‌ট্রিক" ('যোগীনদা') প্রভৃতি মন্তব্যে তাঁর বিরক্তি স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ কৃষিপ্রধান গ্রামকে উৎখাত করে অবাধ নগরায়ণ চান নি; চান নি মানুষ *রক্তকরবী*-র যক্ষপুরীর মতো সত্তাহীন যন্ত্র হয়ে উঠুক।

টীকা

১. কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়। *ছড়ার ছবি*-র পাঠে কঙ্কালী চাটুজ্জে বলে উল্লিখিত হলেও *ছেলেবেলা* গ্রন্থে 'বালক'-এর পাঠে কিশোরী চাটুজ্জেই রয়েছে।

২. তুলনীয়, অন্নদাশঙ্করের ছড়া :

দৌড়! দৌড়! দিলেন দৌড়
গৌড় থেকে বঙ্গ
লক্ষণ সেন রাজা, তার
রাজ্য হলো ভঙ্গ।
.....
দৌড়! দৌড়! দিলেন দৌড়
বঙ্গ থেকে গৌড়
লক্ষ লক্ষ সেন যেন
লক্ষ লক্ষ চৌর!

৩. 'যেতে নাহি দিব'-তে কর্তা অবশ্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তি; তাঁর কর্মস্থলে যাবার আয়োজন বিশাল। 'দেশান্তরী'র নায়কের মতো দরিদ্র মানুষদের স্বজন ছেড়ে বিদেশযাত্রা আরও করুণ।

৪. তুলনীয়, 'দুই বিঘে জমি' কবিতায়—

করিল ডিক্রি সকলি বিক্রি মিথ্যে দেনার খতে

৫. রবীন্দ্রনাথ জমিদারিকে ট্রাস্টের মাধ্যমে চালাতে চেয়েছিলেন; কিন্তু পারেন নি। তবে রায়তদের দুঃখে ব্যথিত হয়েছিলেন। *ছেলেবেলা* গ্রন্থে লিখেছেন : "হতভাগ্য রায়তদের দোহাই-পাড়া কান্না উপরওয়ালার কানে পৌঁছাত না। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪০২, ১৪ : ৭৩০]

৬. এই গো-প্রীতিকে কোনো কোনো সমালোচক গো-দেবতার প্রতি ভক্তির সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এমনকি মুসলমানদের কোরবানি উপলক্ষে গো-হত্যার বিরোধকারীদের সমালোচনা করেছিলেন।

৭. তুলনীয় 'দুই বিঘে জমি'র পঙ্‌ক্তি—

কহিলেন শেষে ক্রুর হাসি হেসে আচ্ছা সে দেখা যাবে।

গ্রন্থপঞ্জি

অজিত দত্ত ১৯৬০। *বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস*, কলকাতা : জিজ্ঞাসা।

অনাথনাথ দাস ১৯৯৩। *শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স।

অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০২। *রবীন্দ্ররচনাভিধান*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা : দীপ প্রকাশন।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৩৯৩। *রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা*, কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।

জগদীশ ভট্টাচার্য। *কবি-মানসী*। কলকাতা।

নেপাল মজুমদার ১৯৯১। *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৯৫ (১৩৬৬)। *রবীন্দ্র জীবনকথা*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪০১ (১৩৬৩)। *রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী।

মৈত্রেয়ী দেবী ১৯৬৭ (১৯৪৩)। *মংপুতে রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা : রূপা অ্যান্ড সন্স।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৬। *ছড়ার ছবি*, কলকাতা : বিশ্বভারতী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২*। *রবীন্দ্র রচনাবলী*, কলকাতা : বিশ্বভারতী।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ১৩৬৬। *রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৪০৬ (১৩৭৩)। *রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়*, কলকাতা : মণ্ডল বুক হাউস।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৩৭৯। *রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়* (অখণ্ড), কলকাতা : মণ্ডল বুক হাউস।

সুকুমার সেন ১৯৯৬। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ক্ষুদিরাম দাস ১৯৯৪। *চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী*, কলকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স।

সৈয়দ মুজতবা আলী ১৩৭১। *দেশে-বিদেশে*, ঢাকা : ষ্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স।

* প্রকাশকালের পরবর্তী সংখ্যা খণ্ডনির্দেশক।